বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থ কেবল "কমলাকান্তের দপ্তরের" পুনঃ সংস্করণ নহে। "কমলাকান্তের দপ্তর" ভিন্ন ইহাতে "কমলাকান্তের পত্র" ও "কমলাকান্তের জোবানবন্দী" এই দুইখানি নূতন গ্রন্থ আছে।

কমলাকান্তের দপ্তরেও দুইটি নূতন প্রবন্ধ এবার বেশী আছে। "চন্দ্রালোকে," এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" এই দুইটি প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের প্রথম সংস্করণে পরিত্যাগ করা গিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, ঐ দুইটি আমার প্রণীত নহে। "চন্দ্রালোকে" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচিত; এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত। উঁহারা স্বকৃত রচনার মধ্যে ঐ প্রবন্ধদ্বয় পুনর্মুদ্রিত করিবেন এই ইচ্ছায়, কমলাকান্তের দপ্তরের প্রথম সংস্করণে ঐ দুইটি পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। এক্ষণে লেখকদিগের নিকট জানিয়াছি যে, তাঁহারা ঐ দুইটি প্রবন্ধ নিজে নিজে পুনর্মুদ্রিত করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব, তাঁহাদের অনুমতিক্রমে ঐ দুইটি প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের দ্বিতীয় সংস্করণভুক্ত করা গেল।

কমলাকান্তের পত্র তিনখানি মাত্র বঙ্গ-দর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনখানি ভাঙ্গিয়া এখন চারিখানি হইয়াছে। "বুড়া বয়সের কথা" যদিও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নামযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি উহার মর্ম্ম কমলাকান্তি বলিয়া উহাও "কমলাকান্তের পত্র" মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। মোটে পাঁচখানি।

"কমলাকান্তের জোবানবন্দী" সমেত সর্ব্বশুদ্ধ আটটি নূতন পুনর্মুদ্রিত করা গেল। গ্রন্থের আকার অনেক বাড়িয়াছে বলিয়া এবং অন্যান্য কারণেও গ্রন্থের মূল্যও বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছি।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

"ঢেঁকি" শীর্ষক প্রবন্ধটি ভুলক্রমে পূর্ব্বসংস্করণভুক্ত হয় নাই। উহাও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল।

সূচী।

কমলাকান্তের দপ্তর।

(তৃতীয় সংস্করণ।)

উৎসর্গ।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য

শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয়কে

এই গ্রন্থ

প্রণয়োপহার স্বরূপ

অর্পিত

হইল।

প্রথম বারের

বিজ্ঞাপন।

কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। বঙ্গদর্শনে যে কয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে "চন্দ্রালোকে", "মশক" এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" এই তিন সংখ্যা আমার প্রণীত নহে, এই জন্য ঐ তিন সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না।

বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের দপ্তর সমাপ্ত হয় নাই। এই জন্য এই গ্রন্থের নামকরণে "প্রথম খণ্ড" লেখা হইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কমলাকান্তের দপ্তর।

অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। সে কখন্ কি বলিত, কি করিত, তাহার স্থিরতা ছিল না। লেখা পড়া না জানিত, এমত নহে। কিছু ইংরেজি, কিছু সংস্কৃত জানিত। কিন্তু যে বিদ্যায় অর্থোপার্জ্জন হইল না, সে বিদ্যা কি বিদ্যা? আসল কথা এই, সাহেব সুবোর কাছে যাওয়া আসা চাই। কত বড় বড় মূর্খ, কেবল নাম দস্তখত করিতে পারে,—তাহারা তালুক মুলুক করিল—আমার মতে তাহারাই পণ্ডিত। আর কমলাকান্তের মত বিদ্বান্, যাহারা কেবল কতকগুলা বহি পড়িয়াছে, তাহারা আমার মতে গণ্ডমূর্খ।

কমলাকান্তের এক বার চাকরি হইয়াছিল। এক জন সাহেব তাঁহার ইংরেজি কথা শুনিয়া, ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটা কেরাণীগিরি দিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত চাকরি রাখিতে পারিল না। আপিসে গিয়া, আপিসের কাজ

করিত না। সরকারি বহিতে কবিতা লিখিত—আপীসের চিটাপত্রের উপরে সেক্ষপীয়র নামক কে লেখক আছে, তাহার বচন তুলিয়া লিখিয়া রাখিত; বিলবহির পাতায় ছবি আঁকিয়া রাখিত। এক বার সাহেব তাহাকে মাস্কাবারের পে-বিল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কমলাকান্ত বিলবহি লইয়া একটি চিত্র আঁকিল, যে কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে, সাহেব দুই চারিটা পয়সা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছেন। নীচে লিখিয়া দিল "যথার্থ পে-বিল্।" সাহেব নূতনতর পে-বিল্ দেখিয়া কমলাকান্তকে মানে মানে বিদায় দিলেন।

কমলাকান্তের চাকরি সেই পর্য্যন্ত। অর্থেরও বড় প্রয়োজন ছিল না। কমলাকান্ত কখন দারপরিগ্রহ করেন নাই। স্বয়ং যেখানে হয়, দুইটি অন্ন এবং আধ ভরি আফিম পাইলেই হইত। যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত। অনেক দিন আমার বাড়ীতে ছিল। আমি তাহাকে পাগল বলিয়া যত্ন করিতাম। কিন্তু আমিও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। সে কোথাও স্থায়ী হইত না। এক দিন প্রাতে উঠিয়া ব্রহ্মচারীর মত গেরুয়া-বস্ত্র পরিয়া, কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে পাইলাম না। সে এ পর্য্যন্ত আর ফিরে নাই।

তাহার একটি দপ্তর ছিল। কমলাকান্তের কাছে ছেঁড়া কাগজ পড়িতে পাইত না; দেখিলেই তাহাতে কি মাথা মুণ্ড লিখিত, কিছু বুঝিতে পারা যাইত না। কখন কখন আমাকে পড়িয়া শুনাইত—শুনিলে আমার নিদ্রা আসিত। কাগজগু

একখানি মসীচিত্রিত, পুরাতন, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা থাকিত ; গমনকালে, কমলাকান্ত আমাকে সেই দপ্তরটি দিয়া গেল। বলিয়া গেল, তোমাকে ইহা বখ্‌শিশ করিলাম।

এ অমূল্য রত্ন লইয়া আমি কি করিব ? প্রথমে মনে করিলাম, অগ্নিদেবকে উপহার দিই। পরে লোকহিতৈষিতা আমার চিত্তে বড় প্রবল হইল। মনে করিলাম যে, যে লোকের উপকার না করে, তাহার বৃথায় জন্ম। এই দপ্তরটিতে অনিদ্রার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে—যিনি পড়িবেন, তাঁহারই নিদ্রা আসিবে। যাঁহারা অনিদ্রা রোগে পীড়িত, তাঁহাদিগের উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস।

প্রথম সংখ্যা

একা।

"কে গায় ওই?"

বহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? এই সঙ্গীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে। পথিক পথ দিয়া, আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর;—মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের সুখের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলিস্পর্শের ন্যায়, ঐ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন?

কেন, কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী-সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অর্দ্ধাবৃতা সুন্দরীর নীল বসনের ন্যায় শীর্ণশরীরা নীল-সলিলা তরঙ্গিণী, সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন; রাজপথে, কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া, আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সংগীতে আমার হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।

আমি একা—তাই এই সংগীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরী মধ্যে, এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জন-স্রোতোমধ্যে, মিশিয়া এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবুদ্বুদ সমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্বুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

তাহা জানি না—কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধী কিন্তু যদি ঘ্রাণগ্রহণকর্ত্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধী হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত ঐ সংগীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোত্থিত সংগীত শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই। যৌবনে, যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা

রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, মনুষ্য-চরিত্র এখনও তাই আছে। কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সংগীত শুনিয়া আনন্দ হইত। আজি এই সংগীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে সুখে, সেই আনন্দ অনুভূত করিতাম, সেই অবস্থা সেই সুখ, মনে পড়িল। মুহূর্ত্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া, মনে মনে, সমবেত বন্ধুমণ্ডলী মধ্যে বসিলাম; আবার সেই অকারণসঞ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া এখন বলি না, নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এ সংগীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়। তখন সংগীত ভাল লাগিত,—এখন লাগে না—চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্ব্বস্মৃতিসূচক সংগীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।

সে প্রফুল্লতা, সে সুখ, আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জ্জন এবং ক্ষতি উভয়েই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জ্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখদ বস্তু সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্ত্তি কমে কেন? পৃথিবী আর

তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছ কল্লোলিনী-শীকর-সিক্ত, বসন্তপবনবিধূত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিল কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিল কাচ। যৌবনে অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিত। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী কোথায়? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখান-কার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে; যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্ত্তন করিতেছি মাত্র এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে,

উদ্যানে সর্প আছে; মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল

এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে

নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন

মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে,

ন্যায় উজ্জ্বল, পিত্তলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর

পঙ্ক ও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ। কাংস্য ও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।—কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয় বার শুনিতে চাহি না। উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সংগীত, তেমনি সংসারের এক সংগীত আছে। সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সংগীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল। সে সঙ্গীত আর কি শুনিব না? শুনিব, কিন্তু নানাবাদ্যধ্বনি-সংমিলিত. বহুকণ্ঠপ্রসূত সেই পূর্ব্বশ্রুত সংসারগীত আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্তসহায় একমাত্র গীতধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসারসংগীত। অনন্ত কাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

দ্বিতীয় সংখ্যা

মনুষ্য ফল।

আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনুষ্য সকল ফল বিশেষ—মায়াবৃন্তে সংসার-বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। সকলগুলি পাকিতে পায় না—কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায়। কোনটী পোকায় খায়, কোনটিকে পাখীতে ঠোক্‌রায়। কোনটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। কোনটি সুপক্ক হইয়া, আহরিত হইলে গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণভোজনে লাগে—তাহাদিগেরই ফলজন্ম বা মনুষ্যজন্ম সার্থক। কোনটি সুপক্ক হইয়া, বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া মাটীতে পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায়। তাহাদিগের মনুষ্যজন্ম বা ফলজন্ম বৃথা। কতকগুলি তিক্ত, কটু বা কষায়;—কিন্তু তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত

কতকগুলি বিষময়—যে খায়, সেই মরে। আর কতকগুলি মাকাল জাতীয়—কেবল দেখিতে সুন্দর।

কখন কখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিতে পাই যে, পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক্ জাতীয় ফল। আমাদের দেশের একপ্রকার ভদ্রলোকদিগকে মনুষ্যজাতি মধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি খাসা খাজা কাঁটাল, কতকগুলির বড় আটা, কতকগুলি কেবল ভুতুড়িসার, গরুর খাদ্য। কতকগুলি ইঁচোড়ে পাকে, কতকগুলি কেবল ইঁচোড়েই থাকে, কখন পাকে না। কতকগুলি পাকিলে পাকিতে পারে, কিন্তু পাকিতে পায় না, পৃথিবীর রাক্ষস রাক্ষসীরা ইঁচোড়েই পাড়িয়া কালিয়া রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে। যদি পাকিল, ত বড় শৃগালের দৌরাত্ম্য। যদি গাছ ঘেরা থাকে, ত ভালই। যদি কাঁটাল উচুঁ ডালে ফলিয়া থাকে, ভালই; নহিলে শৃগালেরা কাঁটাল কোনমতে উদরসাৎ করিবে। শৃগালেরা কেহ দেওয়ান, কেহ কারকুন, কেহ নায়েব, কেহ গোমস্তা, কেহ মোছাহেব, কেহ কেবল আশীর্ব্বাদক। যদি এ সকলের হাত এড়াইয়া, পাকা কাঁটাল ঘরে গেল, অমনি মাছি ভন্ ভন্ করিতে আরম্ভ করিল। মাছিরা কাঁটাল চায় না, তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন। এ মাছিটি কন্যাভার-গ্রস্ত, উহাকে এক ফোঁটা রস দাও,—এটির মাতৃদায়, একটু রস দাও। এটি একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও,—সেটি পেটের [illegible] একখানি সম্বাদ-পত্র করিয়াছে, উহাকেও একটু দাও। [illegible] কাঁটালের দ্বিতীয় ভাতরপুত্রের প্রশ্বশুর জ্ঞাতিপুত্র—[illegible] না, কিছু রস দাও;—সে মাছিটির চৌদ্দ পৌরুষে [illegible]

পড়ে, কিছু রস খাও। আবার এ দিগে কাঁটাল ঘরে রাখা ভাল না—পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠে। আমার বিবেচনায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া, উত্তম নির্জ্জল দুধের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া, কমলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহ্মণকে ভোজন করানই ভাল।

এ দেশের সিবিল সর্ব্বিসের সাহেবদিগকে আমি মনুষ্য জাতি মধ্যে [illegible] ফল মনে করি। এ দেশে আম ছিল না, সাগর পার হইতে কোন মহাত্মা এই উপাদেয় ফল এ দেশে আনিয়াছেন। আম্র দেখিতে রাঙ্গা রাঙ্গা, ঝুড়ি আলো করিয়া বসে। কাঁচায় বড় টক—পাকিলে সুমিষ্ট বটে, কিন্তু তবু আঁটির কাছে টক যায় না। কতকগুলা আম এমন কদর্য্য, যে পাকিলেও টক যায় না। কিন্তু দেখিতে বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা হয়, বিক্রেতা ফাঁকি দিয়া পাঁচ টাকা শ বিক্রয় করিয়া যায়। কতকগুলি আম [illegible]—পাকিলে পানশে। কতক আম দাঁতে পা[illegible]লি কুটিয়া নূন মাখিয়া আমসী ভাল[illegible]

[illegible] আম্র খাইতে [illegible] সদ্য গাছ হইতে পাড়িবা[illegible] নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলাম জলে ফেলিয়া যদি রাখিতে পার, তবে সে জলে একটু খোসামোদ-ও শীতল হইবে। তার পরে ছুরি চালাইয়া [illegible] পার।

[illegible] লৌকিক [illegible] [illegible]

রজ্জু যেন, একটা থাকা থাকে—তাহা হইলে অনেক নরহ-[illegible]ারণ হইবে। আমি জানি না নারিকেলের রজ্জু গলায় বাঁধিয়া কেহ কখন প্রাণত্যাগ করিয়াছে কি না, কিন্তু রমণীর রূপরজ্জু গলায় বাঁধিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে?

বৃক্ষের নারিকেল এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে, আমার বিবাদ এই যে, আমি হতভাগা, দুইয়ের একটিও আহরণ করিতে পারিলাম না। অন্য ফল আকর্ষী দিয়া পাড়া যায়, কিন্তু নারিকেল গাছে না উঠিলে পাড়া যায় না। গাছে উঠিতে গেলেও হয় নিজের পায়ে দড়ি বাঁধিতে হইবে, না হয় ডোমের খোসামোদ করিতে হইবে।*

ডোমের খোসামোদ করিতেও রাজি আছি। কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে কপালে নারিকেল যোটে না। আমি যেমন মানুষ, তেমনি গাছে তেমনি রূপগুণের আকর্ষী দিয়া নারিকেল পাড়িতে পারি। পারি, কিন্তু তা পাছে নারিকেল ঘাড়ে পড়ে। এমন অনেক শ্যামী, বামী, রামী, কামিনী আছে, যে কমলাকান্তকেও স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে, এ দীন অসমর্থ। অতএব এ যাত্রা, কমলাকান্ত ভক্তিভাবে, নারিকেল ফলটি বিশ্বেশ্বরকে দিলেন। তিনি একে শ্মশানবাসী, তাহাতে আবার বিষপান করিয়াছেন—তাই ডাব নারিকেলে তাঁহার কি করিবে?

* কমলাকান্ত বোধ হয়, পুরোহিতকে ডোম বলিতেছেন, [illegible] [illegible] বিবাহ দেন। উঃ কি পাষণ্ড!— [illegible]।

এ দেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমুল ফুল ভাবি। যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না। একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রাঙ্গা দেখা যায়, সেই সুন্দর। ফুলে গন্ধ মাত্র নাই—কোমলতা মাত্র নাই, কিন্তু তবু ফুল বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা। যদি ফুল ঘুচিয়া, ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এই বার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে, অন্তর্লঘু ফল, ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে; তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়িয়া পড়ে।

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতুরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাঁহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতুরা। আমি অনেক দিন হইতে মানস করিয়াছি যে, কুক্কুট-মাংস ভোজন করিয়া হিন্দুজন্ম পবিত্র করিব—কিন্তু এই অধম ধুতুরাগুলার কাঁটার জ্বালায়, পারিলাম না। গুণের মধ্যে এই যে, এই ধুতুরার মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি করে। যে গাঁজাখোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি সাজিয়া দেয়—যে সিদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশা না হয়, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি বাটিয়া দেয়। বোধ হয় হিসাবেই, বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে [illegible]

দিগের নিকট দুই চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন। এখন গাঁথার মধ্যে সেই বচন-খুচরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে। এই নেশায় বঙ্গদেশ আজি কালি মাতিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দুগ্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলেন। গুণের মধ্যে কেবল অম্লগুণ—তাও নিকৃষ্ট অম্ল। তবে এক গুণ মানি—ইহারা সাক্ষাৎ কাষ্ঠাবতার। তেঁতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল। সত্য কথা বলিতে কি, তেঁতুলের মত কুসামগ্রী আমি সংসারে দেখিতে পাই না। যেহ কিয়ৎপরিমাণে খায়, তাহারও অজীর্ণ হয়, সেই অম্ল উদগার করে। যেই অধিক পরিমাণে খায়, সেই অম্লপিত্তরোগে চিররুগ্ন। যাঁহারা সাহেব হইয়াছেন, টেবিলে বসিয়া, গ্যাসের আলোতে, না আর্গাণ্ড জ্বালিয়া, ফয়জু খানসামার হাতের পাক, কাটা চামচে ধরিয়া খাইতে শিখিয়াছেন—তাঁহারা এক দায় এড়াইয়াছেন—তেঁতুলের অম্লের বড় ধার ধারিতে হয় না—আগা গোড়া তেঁতুলের মাছ দেখা ভাত মারিতে হয় না। কিন্তু যাহাদিগকে চালা-ঘরে বসিয়া, মুঙ্গেরে পাত্তর কোলে করিয়া, পদী পিসীর রান্না খাইতে হয়, তাহাদের কি যন্ত্রণা! পদী পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবলী গায়ে দেয়, হাতে তুলসীর মালা, কিন্তু রাঁধিবার বেলা কলায়ের ডাল, আর তেঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছুই রাঁধিতে জানেন না। ফয়জু জাতিতে নেড়ে রাঁধে অমৃত।

আর একটি [illegible] কথা বলা হইলেই সদ্য ক্ষান্ত হই।

এ হাকিমেরা কোন্ ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন, করুন আমি স্পষ্ট কথা বলিব, ইহারা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে তবেই ইহারা উঁচুতে ফলিলেন—নহিলে মাটিতে গড়াগড়ি যান। যেখানে ইচ্ছা সেখানে তুলিয়া দাও, একটু ঝড় বাতাসেই লতা ছিঁড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি। অনেকগুলি রূপেও কুষ্মাণ্ড, গুণেও কুষ্মাণ্ড।—তবে কুষ্মাণ্ড এখন দুই প্রকার হইয়াছে—দেশী কুমড়া ও বিলাতি কুমড়া। বিলাতী কুমড়া বলিলে এমত বুঝায় না, যে, এই কুমড়াগুলি বিলাত হইতে আসিয়াছে। যেমন দেশী মুচির তৈয়ারি জুতাকে ইংরেজি জুতা বলে, ইহারাও সেই রূপ বিলাতি। বিলাতি কুমড়ার যে গৌরব অধিক ইহা বলা বাহুল্য। সংসারোদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য, কদর্য্য, টক—

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

তৃতীয় সংখ্যা।

ইউটিলিটি * ।

বা

উদর-দর্শন।

বেন্থাম হিতবাদ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

---

* "ইউটিলিটি" শব্দের অর্থ কি? ইহার কি বাঙ্গালা নাই? আমি নিজে ইংরেজি জানি না—কমলাকান্তও কিছু বলিয়া দেয় নাই—অতএব অগত্যা আমার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমার পুত্র, টেকসমাপ্তী দেখিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে—"ইউ" শব্দে তুমি বা তোমরা, "টিল" শব্দে চাষ করা, "ইট" শব্দে খাওয়া, "ই" অর্থে কি, তাহা সে বলিতে পারিল না, কিন্তু বোধ করি কমলাকান্ত, "ইউ-টিল-ইট-ই" শব্দে ইহাই অভিপ্রেত করিয়াছেন যে, "তোমরা চাষ করিয়াই খাও!" কি পাষণ্ড! সকলকেই চাষা বলিল! [illegible] পলায়ন মহাশয়ের গ্রন্থের রচনা পাঠ করাতেও পাপ আছে। তবে বলি, আমার পুত্রটি ইংরেজি লেখা পড়ায় ভাল হইয়াছে, নচেৎ এরূপ [illegible] শব্দের অর্থ করিতে পারিত না।—শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীশ।

আমি হিতবাদ মতে অমত করি না; বরং আমি উহার অনুমোদক, তবে, আপনারা জানেন কি না বলিতে পারি না, আমি এক জন সুযোগ্য দার্শনিক। আমি এই হিতবাদ দর্শন অবলম্বন করিয়া, কিছু ভাঙ্গিয়া, কিছু গড়িয়া, একটি নূতন দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি। প্রকৃত পক্ষে, তাহা, বাঙ্গালায় প্রচলিত হিতবাদ দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা মাত্র। তাহার স্থূল মর্ম্ম আমি সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রাচীন প্রথানুসারে দর্শনটি সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে। এবং আমি স্বয়ংই সূত্রের ভাষ্য করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছি। বাঙ্গালাতেই সূত্রগুলি লিখিত হইয়াছে। আমি যে অসংস্কৃতজ্ঞ এমত কেহ মনে করিবেন না। তবে সংস্কৃতে সূত্রগুলি কয় জন বুঝিতে পারিবে? অতএব, সাধারণ পাঠকের প্রতি অনুকূল হইয়া বাঙ্গালাতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি। সে সূত্রগ্রন্থের সারাংশ এই;—

১। জীব শরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর বিশেষকে উদর বলে।

ভাষ্য।

"বৃহৎ"—অর্থাৎ নাসিকা কর্ণাদি ক্ষুদ্র গহ্বরকে উদর বলা যায় না। বলিলে বিশেষ প্রত্যবায় আছে।

"জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর"—জীবশরীরস্থ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নহিলে পর্ব্বতগুহা প্রভৃতিকে উদর বলিয়া পরিচয় দিয়া কেহ তাহার পূর্ত্তির প্রত্যাশা করিতে পারেন।

"গহ্বর"—যদিও জীবশরীরস্থ গহ্বর বিশেষই উদ

বাচ্য, তথাপি অবস্থা বিশেষে অঞ্জলি প্রভাৎও উদর মধ্যে গণ্য। কোন স্থানে উদর পুরাইতে হয়, কোন স্থানে অঞ্জলি পুরাইতে হয়।

২। উদরের ত্রিবিধ পূর্ত্তিই পরম পুরুষার্থ।

ভাষ্য।

সাংখ্যেরও এইমত। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ উদর-পূর্ত্তি।

"আধিভৌতিক"—অন্ন ব্যঞ্জন সন্দেশ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভৌতিক সামগ্রীর দ্বারা উদরের যে পূর্ত্তি হয়, তাহাই আধিভৌতিক পূর্ত্তি।

"আধ্যাত্মিক"—যাহারা বড়লোকের বাক্যে তুষ্ট হইয়া কালযাপন করেন, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উদর পূর্ত্তি হয়।

"আধিদৈবিক"—দৈবানুকম্পায় প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি দ্বারা যাহাদের উদর পূরিয়া উঠে, তাঁহাদিগের আধিদৈবিক উদর-পূর্ত্তি।

৩। এতন্মধ্যে আধিভৌতিক পূর্ত্তিই বিহিত।

ভাষ্য।

"বিহিত"—বিহিত শব্দের দ্বারা অন্যান্য পূর্ত্তির প্রতিষেধ হইল কি না, ভবিষ্যৎ ভাষ্যকারেরা মীমাংসা করিবেন।

এক্ষণে সিদ্ধ হইল, উদরনামক মহা-গহ্বরে লুচি সন্দেশ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের প্রবেশই পুরুষার্থ। অতএব এক্ষণে মধ্যে কি প্রকারে ভূত প্রবেশ করান যাইতে পারে নির্বাচন করা যাইতেছে।

৪ বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রম উপাসনা বল এবং প্রতারণা এই ষড়বিধ পুরুষার্থের উপায়, পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভাষ্য।

১। "বিদ্যা"—বিদ্যা কি, তাহা অবধারণ করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, লিখিতে ও পড়িতে শিখাকে বিদ্যা বলে। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যার জন্য বিশেষ লিখিতে বা পড়িতে শিখার প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ লিখিতে সম্বাদ পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন যে, যে লিখিতে জানে না, সে পত্রাদিতে লিখিবে কি প্রকারে? আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুম্ভীরশাবক ডিম্ব ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া সাঁতার দিতে থাকে, শিখিতে হয় না। সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালির স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখা পড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।

২। "বুদ্ধি"—যে আশ্চর্য্য শক্তিদ্বারা তৃণকে লৌহ, লৌহকে তৃণ বিবেচনা হয়, সেই শক্তিকেই বুদ্ধি বলে। কৃপণের সঞ্চিত ধনরাশির ন্যায় ইহা আমরা স্বয়ং সর্ব্বদা দেখিতে পাই, কিন্তু পরে কখন দেখিতে পায় না। পৃথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা বোধ হয় জগতে ইহারই আধিক্য। কেন না, কখন কেহ বলিল না যে, ইহা আমি অল্প পরিমাণে পাইয়াছি।

৩। "পরিশ্রম"—উপযুক্ত সময়ে উদরপূর্ণ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন, নিদ্রা, বায়ু সেবন, তামাকুর ধূমপান, পৃথিবীর [illegible] গুরুতর কার্য্যসম্পাদনের নাম পরিশ্রম।

৪। "উপাসনা"—কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, হয় তাহার গুণানুবাদ, নয় দোষকীর্ত্তন করিতে হয়। কোন ক্ষমতাশালী প্রধানব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ কথা হইলে, যদি তিনি প্রকৃত দোষযুক্ত ব্যক্তি হয়েন, তবে তাঁহার দোষকীর্ত্তন করাকে নিন্দা বলে। আর তিনি যদি দোষযুক্ত না হয়েন, তবে তাঁহার দোষকীর্ত্তনকে স্পষ্টবক্তৃত্ব বা রসিকতা বলে। পক্ষান্তরে, তিনি যদি গুণহীন হয়েন, তবে তাঁহার গুণকীর্ত্তনকে স্তাবকতা বলে। আর যদি তিনি যথার্থ গুণবান্ হয়েন তবে তাঁহার গুণকীর্ত্তনকে উপাসনা বলে।

৫। "বল"—দীর্ঘছন্দ বাক্য—মুখ চক্ষুর আরক্তভাব এবং তৎসহিত ডাক হাঁক,—মুখ হইতে অনর্গল, হিন্দী, ইংরাজী ও নিষ্ঠীবনের বৃষ্টি,—দূর হইতে ভঙ্গীসহকারে কিল, চড় ঘুষা এবং লাথি প্রদর্শন ও সাধ্য তিরস্কার প্রকার অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী এবং পরপক্ষের কোন প্রকার উদ্যম দেখিলে অকালে পলায়ন ইত্যাদিকে বল বলে।

বল ষড়্‌বিধ, যথা :—

মৌখিক—অভিসম্পাত, গালি, নিন্দা প্রভৃতি।

হাস্ত—কিল চড় প্রদর্শন প্রভৃতি।

পাদ—পলায়নাদি।

তাজ্জব—রোদনাদি। যথা, চাণক্যপণ্ডিত,—"বালানাং রোদনং বলং" ইত্যাদি।

সমুদ্রে পাতালে বা

৬। প্রতারণা—

"নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পৃথিবীমধ্যে প্রতারক বলিয়া জানিও।"

এক, পণ্যাজীব। প্রমাণ—দোকানদার জিনিষ বেচিয়া আবার মূল্য চাহিতে থাকে। মূল্যদাতা মাত্রেরই মত যে, তিনি ক্রয়কালীন প্রতারিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয়, চিকিৎসক। প্রমাণ—রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইলে পরে যদি চিকিৎসক বেতন চান, তবে রোগী প্রায় সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, আমি নিজে আরাম হইয়াছি; এ বেটা অনর্থক ফাকি দিয়া টাকা লইতেছে।

তৃতীয়, ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি। ইহাঁরা চির-প্রসিদ্ধ প্রতারক, ইহাঁদিগের নাম "ভণ্ড"। ইহাঁরা যে প্রতারক, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, ইহাঁরা অর্থাদির কামনা করেন না।

ইত্যাদি।

৫। এই ষড়্‌বিধ উপায়ের দ্বারা উদরপূর্ত্তি বা পুরুষার্থ অসাধ্য।

ভাষ্য।

এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করা যাইতেছে। বিদ্যাদি ষড়্‌বিধ উপায়ের দ্বারা যে উদরপূর্ত্তি হইতে পারে না, ক্রমে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

"বিদ্যা"—বিদ্যাতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত, তবে বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের অন্নাভাব কেন?

"বুদ্ধি"—বুদ্ধিতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত, তবে গর্দ্দভ মরিবে কেন?

"পরিশ্রম"—পরিশ্রমে যদি হইত, তবে বাঙ্গালি বাবুরা কেরাণী কেন?

"উপাসনা"—উপাসনায় যদি হইত, তবে সাহেবগণ কমলাকান্তকে অনুগ্রহ করেন না কেন? আমিত মন্দ পেবিল লিখি নাই।

"বল"—বলে যদি হইত, তবে আমরা পড়িয়া মার খাই কেন?

"প্রতারণা"—প্রতারণায় যদি হইত, মদের দোকান কখন কখন ফেল হয় কেন?

৬। উদরপূর্ত্তি বা পুরুষার্থ কেবল হিতসাধনের দ্বারা সাধ্য।

ভাষ্য।

উদাহরণ। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা লোকের কানে মন্ত্র দিয়া তাহাদের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বন্যজাতির হিতসাধন করিয়াছেন, এবং রুসেরা এক্ষণে মধ্য-আসিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন। বিচারকগণ বিচার করিয়া দেশের হিতসাধন করিতেছেন। অনেকে সুবিক্রেয় এবং অবিক্রেয় পুস্তক ও পত্রাদি প্রণয়ন দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতেছেন। এ সকলের প্রচুর পরিমাণে উদরপূর্ত্তি অর্থাৎ পুরুষার্থলাভ হইতেছে

৭। অতএব সকলে দেশের হিতসাধন কর।

ভাষ্য।

এই শেষ সূত্রের দ্বারা হিতবাদ দর্শন, এবং উদর দর্শনের একতা প্রতিপাদিত হইল। সুতরাং এই স্থলে কমলাকান্তের সূত্রগ্রন্থের সমাপ্তি হইল। ভরসা করি ইহা ভারতবর্ষের সপ্তম দর্শনশাস্ত্র বলিয়া আদৃত হইবে।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

চতুর্থ সংখ্যা

পতঙ্গ।

বাবুর বৈঠকখানায় সেজ জ্বলিতেছে—পাশে আমি, মোসা-য়েবি ধরণে বসিয়া আছি। বাবু দলাদলির গল্প করিতেছেন,—আমি আফিম চড়াইয়া ঝিমাইতেছি। দলাদলিতে চটিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিয়াছি। বিধিলিপি! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি ক্রিয়া পরম্পরার একটী ফল এই যে, উনবিংশ শতাব্দীতে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য রাত্রে নসীরাম বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলি-বেন। সুতরাং আমার সাধ্য কি যে তাহার অন্যথা করি।

ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে, একটা পতঙ্গ আসিয়া ফানুসের চারি পাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। "চোঁ-ও-ও-ও" "বোঁ-ও-ও" করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের ঝোঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গের ভাষা কি বুঝিতে পারি না? কিছু-ক্ষণ কাণ পাতিয়া শুনিলাম—কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে পতঙ্গকে বলিলাম, "তুমি কি ও চোঁ বোঁ করিয়া বলিতেছ,

বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন হঠাৎ আমার
কর্ণ প্রাপ্ত হইলাম—শুনিলাম, পতঙ্গ বলিল, "আমি
সঙ্গে কথা কহিতেছি—তুমি চুপ কর।" আমি তখন চুপ
করিয়া পতঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম পতঙ্গ বলিতেছে—

দেখ, আলো মহাশয়, তুমি সে কালে ভাল ছিলে—পিতলের পিলসুজের উপর মেটে প্রদীপে শোভা পাইতে—আমরা স্বচ্ছন্দে পুড়িয়া মরিতাম। এখন আবার সেজের ভিতর ঢুকিয়াছ—আমরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াই—প্রবেশ করিবার পথ পাই না, পুড়িয়া মরিতে পাই না।

দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে—আমাদের চিরকালের হক্। আমরা পতঙ্গজাতি, পূর্ব্বাপর আলোতে পুড়িয়া মরিয়া আসিতেছি—কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে নাই। তেলের আলো, বাতির আলো, কাঠের আলো, কোন আলো কখন বারণ করে নাই। তুমি কাচ মুড়ি দিয়া আছ কেন, প্রভু? আমরা গরিব পতঙ্গ—আমাদের উপর সহমরণ নিষেধের আইন জারি কেন? আমরা কি হিন্দুর মেয়ে যে, পুড়িয়া মরিতে পাব না?

দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। হিন্দুর মেয়েরা আশা ভরসা থাকিতে কখন পুড়িয়া মরিতে চাহে না—আগে বিধবা হয়, তবে পুড়িয়া মরিতে বসে। আমরাই কেবল সকল সময়ে আত্মবিসর্জ্জনে ইচ্ছুক। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতির তুলনা?

আমাদিগের ন্যায়, স্ত্রীজাতিও রূপের শিখা জ্বলিতে দেখিলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে বটে। ফলও এক,—আমরাও পুড়িয়া মরি, তাহারাও পুড়িয়া মরে। কিন্তু, দেখ, সেই দাহতেই তাদের

সুখ,—আমাদের কি সুখ? আমরা কেবল পুড়িবার জন্য পুড়ি, মরিবার জন্য মরি। স্ত্রীজাতিতে পারে? তবে আমাদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা কেন?

শুন, যদি জ্বলন্ত রূপে শরীর না ঢালিলাম, তবে এ শরীর কেন? অন্য জীবে কি ভাবে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা পতঙ্গজাতি, আমরা ভাবিয়া পাই না, কেন এ শরীর?—লইয়া কি করিব?—নিত্য নিত্য কুসুমের মধু চুম্বন করি, নিত্য নিত্য বিশ্বপ্রফুল্লকর সূর্য্যকিরণে বিচরণ করি—তাহাতে কি সুখ? ফুলের সেই একই গন্ধ, মধুর সেই একই মিষ্টতা, সূর্য্যের সেই এক প্রকারই প্রতিভা। এমন অসার, পুরাতন বৈচিত্র্যশূন্য জগতে থাকিতে আছে? কাচের বাহিরে আইস, জলন্ত রূপশিখায় গা ঢালিব।

দেখ, আমার ভিক্ষাটি বড় ছোট—আমার প্রাণ, তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না? দিব বৈ ত গ্রহণ করিব না। তবে ক্ষতি কি? তুমি রূপ, পোড়াইতে জন্মিয়াছ, আমি পতঙ্গ, পুড়িতে জন্মিয়াছি; আইস, যার যে কাজ, করিয়া যাই। তুমি হাসিতে থাক, আমি পুড়ি।

তুমি বিশ্বধ্বংসক্ষম—তোমাকে রোধিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই—তুমি কাচের ভিতর লুকাইয়া আছ কেন? তুমি জগতের গতির কারণ—কার ভয়ে তুমি ডোমের ভিতর লুকাইয়াছ? কোন্ ডোমে এ ডোম গড়িয়াছে? কোন্ ডোমে তোমাকে এ ডোমের ভিতর পুরিয়াছে? তুমি যে বিশ্বব্যাপী, কাচ ভাঙ্গিয়া আমায় দেখা দিতে পার না?

তুমি কি? তা আমি জানি না—আমি জানি না—কেবল

জানি যে, তুমি আমার বাসনার বস্তু—আমার জাগ্রতের ধ্যান—নিদ্রার স্বপ্ন—জীবনের আশা—মরণের আশ্রয়। তোমাকে কখন জানিতে পারিব না—জানিতে চাহিও না—যে দিন জানিব, সেই দিন আমার সুখ যাইবে। কাম্য-বস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে?

তোমাকে কি পাইব না? কত দিন তুমি কাচের ভিতর থাকিবে? আমি কাচ ভাঙ্গিতে পারিব না? ভাল থাক—আমি ছাড়িব না—আবার আসিতেছি—বোঁ—ও—ও

পতঙ্গ উড়িয়া গেল।

নসীরাম বাবু ডাকিল, "কমলাকান্ত!" আমার চমক হইল—চাহিয়া দেখিলাম—বুঝি বড় ঢুলিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু চাহিয়া দেখিয়া নসীবাবুকে চিনিতে পারিলাম না—দেখিলাম, মনে হইল একটা বৃহৎ পতঙ্গ বালিশ ঠেসান দিয়া, তামাকু টানিতেছে। সে কথা কহিতে লাগিল—আমার বোধ হইতে লাগিল যে, সে চোঁ বোঁ করিয়া কি বলিতেছে। এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাচময়। যে আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই—কই, তাহা ত পাই না—আবার ফিরিয়া বোঁ

করিয়া চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে, সংসার এত দিন পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্ম্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম্ম মানসপ্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয় জন বাঁচিত? অনেকে জ্ঞান-বহ্নির আবরণ কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সক্রেতিস্, গেলিলিও তাহাতে পড়িয়া মরিল। রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মান-বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্য্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন;—জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত "Paradise Lost"। ধর্ম্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় কবি, সেণ্ট পল। ভোগ-বহ্নির পতঙ্গ, "আণ্টনি, ক্লিওপেত্রা।" রূপ-বহ্নির "রোমিও ও জুলিয়েত," ঈর্ষা-বহ্নির "ওথেলো"। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ-বহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি। বহ্নি কি আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে। ধর্ম্মপুস্তক হারি মানে, কাব্য গ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?

দেখ ভাই, পতঙ্গের দল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই। পার, আগুনে পড়িয়া পুড়িয়া মর। না পার, চল, "বোঁ" করিয়া চলিয়া যাই।

শ্রীকমলাকান্ত

পঞ্চম সংখ্যা

আমার মন।

আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছিল, সেখানে ত নাই। যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই। কে চুরি করিল? কই, সাত পৃথিবী খুঁজিয়া ত আমার "মনচোর" কাহাকে পাইলাম না? তবে কে চুরি করিল?

এক জন বন্ধু বলিলেন, দেখ, পাকশালা খুঁজিয়া দেখ, সেখানে তোমার মন পড়িয়া থাকিতে পারে। মানি, পাকের ঘরে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে পোলাও, কাবাব, কোফ্‌তার সুগন্ধ, যেখানে ডেক্‌চী-সমারূঢ়া অন্নপূর্ণার মৃদু মৃদু ফুটফুটবুটবুটটকবকোধ্বনি, সেইখানে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে ইলিস মৎস্য, সতৈল অভিষেকের পর ঝোল-

স্বর্ণময়, কাঞ্চনময়, কাচময়, বা [illegible]

সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখানেই আমার প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকে, ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া, তীর্থস্থান আর ছাড়িতে চায় না। যেখানে ছাগনন্দন, দ্বিতীয় দধীচির ন্যায়, পরোপকারার্থ আপন অস্থি সমর্পণ করেন, যেখানে মাংসসংযুক্ত সেই অস্থিতে কোরমা রূপ বজ্র নির্ম্মিত হইয়া, ক্ষুধারূপ বৃত্রাসুর বধের জন্য প্রস্তুত থাকে, আমার মন সেইখানেই, ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য বসিয়া থাকে। যেখানে, পাচকরূপী বিষ্ণুকর্ত্তৃক, লুচিরূপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই গিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। অথবা যে আকাশে লুচি চন্দ্রের উদয় হয়, সেইখানেই আমার মন-রাহু গিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চায়। অন্যে যাহাকে বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ড মণ্ডলাকার বলিয়া থাকি। যেখানে সন্দেশ রূপ শালগ্রামের বিরাজ, আমার মন সেইখানেই পূজক। হালদারদিগের বাড়ীর রামমণি দেখিতে অতি কুৎসিতা, এবং তাহার বয়ঃক্রম ষাট্ বৎসর, কিন্তু রাঁধে ভাল এবং পরিবেশনে মুক্তহস্তা বলিয়া, আমার মন তাহার সঙ্গে প্রসক্তি করিতে চাহিয়াছিল। কেবল রামমণির সন্তানে পক্ষাঘাত হওয়ায় এটি ঘটে নাই।

সুহৃদের প্রবঞ্চনায়, পাকশালায় মনের সন্ধান করিলাম সেখানে পাইলাম না। পলান্ন, কোফ্তা প্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃদেবগণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন, তাঁহারা কেহ আমার মন চুরি করেন নাই।

বন্ধু বলিলেন, এক বার প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট সন্ধান লও। প্রসন্নের সঙ্গে আমার একটু প্রণয় ছিল বটে, কিন্তু

প্রসন্নটা কেবল গব্যবসায়ক। তবে প্রসন্ন দেখিতে শুনিতে মোটাসোটা, গোলগাল, বয়সে চল্লিশের নীচে, দাঁতে মিসি, হাসিভরা মুখ, কপালের একটি ছোট উল্‌কী টিপের মত দেখাইত; সে রসের হাসি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইত, আমি তাহা কুড়াইয়া লইতাম, এই জন্য লোকে আমার নিন্দা করিত। পূজারি বামণের জ্বালায় বাগানে ফুল ফুটিতে পায় না—আর নিন্দকের জ্বালায় প্রসন্নের কাছে আমার মুখ ফুটিতে পায় না—নচেৎ গব্যরসে ও কাব্যরসে বিলক্ষণ বিনিময় চলিত। ইহাতে আমার নিজের জন্য আমি যত দুঃখিত হই, না হই, প্রসন্নের জন্য আমি একটু দুঃখিত। কেন না প্রসন্ন সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা। এ কথাও আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পাই না। বলিয়াছিলাম বলিয়া, পাড়ার একটি নষ্টবুদ্ধি ছেলে ইহার বিপরীত অর্থ করিয়াছিল। সে বলিল যে, প্রসন্ন আছেন, এজন্য সৎ বা সতী বটে, তিনি সাধু ঘোষের স্ত্রী, এজন্য সাধ্বী; এবং বিধবাবস্থাতেও পতিছাড়া নহেন, এজন্য ঘোরতর পতিব্রতা। বলা বাহুল্য যে, যে অশিষ্ট বালক এই ঘৃণিত অর্থ মুখে আনিয়াছিল, তাহার শিক্ষার্থ, তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কলঙ্ক গেল না।

যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন স্পষ্ট কথা বলা ভাল—আমি প্রসন্নের একটু অনুরাগী বটে। তাহার অনেক কারণ আছে—প্রথমতঃ প্রসন্ন যে দুগ্ধ দেয়, তাহা নির্জ্জল, এবং দামে সস্তা; দ্বিতীয়, সে কখন কখন ক্ষীর সর, নবনীত আমাকে বিনামূল্যে দিয়া যায়; তৃতীয়, সে এক দিন আমাকে কহিয়াছিল, "দাদা-ঠাকুর, তোমার দপ্তরে ও কিসের কাগজ?" আমি লিখিলাম

করিলাম, "শুনবি?" সে বলিল, "শুনিব।" আমি তাহাকে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলাম—সে বসিয়া শুনিল। এত গুণে কোন্ লিপিব্যবসায়ী ব্যক্তি বশীভূত না হয়? প্রসন্নের গুণের কথা আর অধিক কি বলিব—সে আমার অনুরোধে আফিম্ ধরিয়াছিল!

এই সকল গুণে, আমার মন কখন কখন প্রসন্নের ঘরের জানেলার নীচে ঘুরিয়া বেড়াইত, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কেবল তাহার ঘরের জানেলার নীচে নয়, তাহার গোহাল-ঘরের আগড়ের পাশেও উঁকি মারিত। প্রসন্নের প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ, তাহার মঙ্গলা নামে গাইয়ের প্রতিও তদ্রূপ। এক জন ক্ষীর সর নবনীতের আকর, দ্বিতীয়, তাহার দান-কর্ত্রী। গঙ্গা বিষ্ণুপদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভগীরথ তাঁহাকে আনিয়াছেন; মঙ্গলা আমার বিষ্ণুপদ; প্রসন্ন আমার ভগীরথ; আমি দুই জনকেই সমান ভালবাসি। প্রসন্ন এবং তাহার গাই, উভয়েই সুন্দরী; উভয়েই স্থূলাঙ্গী, লাবণ্য-ময়ী, এবং ঘটোঘ্নী। এক জন গব্যরস সৃজন করেন, আর এক জন হাস্যরস সৃজন করেন। আমি উভয়েরই নিকট বিনামূল্যে বিক্রীত।

কিন্তু আজি কালি সন্ধান করিয়া দেখিলাম, প্রসন্নের গবাক্ষতলে, অথবা তাহার গোহালঘরে আমার মন নাই। আমার মন কোথা গেল?

কাঁদিতে কাঁদিতে পথে বাহির হইলাম। দেখিলাম এক যুবতী জলের কলসী কক্ষে লইয়া যাইতেছে। তাহার মুখের উপর [illegible] [illegible] [illegible]; গভীরভাব

ক্ষুদ্র, এবং গম্ভীর-কৃষ্ণ চঞ্চল নয়নতারা দেখিয়া, বোধ হইল এক পদ্মবনে কতকগুলা ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বসিতেছে না, উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার গমনে, যেরূপ অঙ্গ দুলিতেছিল, বোধ হইল যেন লাবণ্যের নদীতে ছোট ছোট ঢেউ উঠিতেছে; তাহার প্রতিপদক্ষেপে বোধ হইল যেন পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল, নিঃসন্দেহ এই আমার মন চুরি করিয়াছে। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সে ফিরিয়া দেখিয়া ঈষৎ রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কিও? সঙ্গ নিয়েছ কেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ।"

যুবতী ভ্রূকুটি করিয়া গালি দিল। বলিল, "চুরি করি নাই। তোমার ভগিনী আমাকে যাচাই করিতে দিয়াছিল। দর করিয়া আমি ফিরিয়া দিয়াছি।"

সেই অবধি শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, মনের সন্ধানে আর রসিকতা করিতে প্রয়াস পাই না, কিন্তু মনে মনে বুঝিয়াছি যে, এ সংসারে আমার মন কোথাও নাই। রহস্য ছাড়িয়া সত্য কথা বলিতেছি, কিছুতেই আমার আর মন নাই। শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতায় মন নাই, যে রহস্যালাপের আমি প্রিয় ছিলাম, সে রহস্যালাপে আমার মন নাই। আমার কতকগুলি ছেঁড়া পুথি ছিল—তাহাতে আমার মন থাকিত, তাহাতে আমার মন নাই। অর্থসংগ্রহে কখন ছিল না—এখনও নাই। কিছুতে আমার মন নাই—আমার মন কোথা গেল?

বুঝিয়াছি, লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন নাই; তাহাদের মন উড়িয়া যায়। আমি কখন কিছুতে মন বাঁধি নাই—এজন্য

কিছুতেই মন নাই। এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয় কেবল মন বাঁধা দিতেই আসি। আমি চিরকাল আপনার রহিলাম—পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই। যাহারা স্বভাবতঃ নিতান্ত আত্মপ্রিয়, তাহারাও বিবাহ করিয়া, সংসারী হইয়া, স্ত্রী পুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে, এজন্য তাহারা সুখী। নচেৎ তাহারা কিছুতেই সুখী হইত না। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই। ধন, যশঃ ইন্দ্রিয়াদিলব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। সকল প্রথম বারে যে পরিমাণে সুখদায়ক হয়, দ্বিতীয় বারে পরিমাণে হয় না, তৃতীয় বারে আরও অল্প সুখদায়ক হয়, অভ্যাসে তাহাতে কিছুই সুখ থাকে না। সুখ থাকে না দুইটি অসুখের কারণ জন্মে; প্রথমতঃ, অভ্যস্ত বস্তুর সুখ না হউক, অভাবে গুরুতর অসুখ হয়; এবং অপরিত আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা হয়। অতএব পৃথিবীতে বিষয় কাম্য বস্তু বলিয়া চিরপরিচিত, তাহা সকলই এবং দুঃখের মূল। সকল স্থানেই যশের অনুগামি ইন্দ্রিয়সুখের অনুগামী রোগ; ধনের সঙ্গে ক্ষতি কান্ত বপু জরাগ্রস্ত বা ব্যাধিদুষ্ট হয়; সুনামেও রটে; ধন, পত্নীজারেও ভোগ করে; মান সম্ভ্র ন্যায় শরতের পর আর থাকে না। বিদ্যা, তুমি কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে ল সংসারের [illegible] জিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না।

সাধনে বিদ্যা কখন সক্ষম হয় না। কখন শুনিয়াছ কেহ বলিয়াছে, আমি ধনোপার্জ্জন করিয়া সুখী হইয়াছি, বা যশস্বী হইয়া সুখী হইয়াছি? যেই এই কয় ছত্র পড়িবে, সেই বেস্ করিয়া স্মরণ করিয়া দেখুক, কখন এমন শুনিয়াছে কি না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কেহ এমত কথা কখন শুনে নাই। ইহার অপেক্ষা ধন মানাদির অকার্য্যকারিতার গুরুতর প্রমাণ আর কি পাওয়া যাইতে পারে? বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এমন অকাট্য প্রমাণ থাকিতেও মনুষ্য মাত্রেই তাহার জন্য প্রাণপাত করে। এ কেবল কুশিক্ষার গুণ। মাতৃস্তন্য-
সঙ্গে সঙ্গে ধনমানাদির সর্ব্বসারবত্তায় বিশ্বাস শিশুর
প্রবেশ করিতে থাকে—শিশু দেখে রাত্রিদিন, পিতা মাতা
ভগিনী গুরু ভৃত্য প্রভৃতি বন্ধু শত্রু মিত্র সকলেই প্রাণপণে
হা যশ, হা মান, হা সম্ভ্রম! করিয়া বেড়াইতেছে।
শিশু কথা ফুটিবার আগেই সেই পথে গমন করিতে
করে মনুষ্য নিত্য সুখের একমাত্র মূল অনুসন্ধান
থিবে? যত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, দার্শনিক, সংসার-
কেহ আস্ফালন কর, সকলে মিলিয়া দেখ, পর-
মনুষ্যের অন্য সুখের মূল আছে কি না? নাই।
াই হইল, আমার নাম গগাস্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু
বলিতেছি, এক দিন মনুষ্যমাত্রে আমার এই
মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই। এখন
উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত
নুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের
হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার

এ আশা এক দিন ফলিবে! ফলিবে, কিন্তু কত দিনে! হায়, কে বলিবে, কত দিনে!

কথাটি প্রাচীন। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে, শাক্যসিংহ এই কথা কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর, শত সহস্র লোকশিক্ষক শত সহস্র বার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই লোকে শিখে না—কিছুতেই আহ্লাদের ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠিতে পারে না। আবার আমাদের দেশ ইংরেজি মুলুক হইয়া এ বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে "মেটিরিয়েল্ প্রস্পেরিটির"* উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ বড় ভালবাসেন—ইংরেজি সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন—তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্ত্তি সকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে—সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কেবল বাহ্য সম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে—দেখ, কেমন রেইলওয়েতে হিন্দুভূমি জালনিবদ্ধ হইয়া উঠিল—দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু! দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার রেইলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার [illegible]নের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারাণ মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে? কাহারও মনের আগুন নিবাইতে পারিবে? ঐ যে কৃপণ ধনকুবের মরিতেছে, উহার ক্ষুধা নিবারণ করিবে? অপমানিতের

* বাহ্য সম্পদ।

অপমান ফিরাইতে পারিবে? রূপোন্মত্তের ক্রোড়ে রূপসীকে তুলিয়া বসাইতে পারিবে? না পারে, তবে তোমার রেইলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি উপাড়িয়া জলে ফেলিয়া দাও—কমলাকান্ত শর্ম্মা তাতে ক্ষতি বিবেচনা করিবেন না।

কি ইংরেজি কি বাঙ্গালা যে সম্বাদ-পত্র, সাময়িক পত্র, স্পীচ, ডিবেট, লেকৃচর, যাহা কিছু পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহ্য সম্পদ ভিন্ন আর কোন বিষয়ের কোন কথা দেখিতে পাই না। হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। হর হর বম্ বম্! টাকার রাশির উপর টাকা ঢাল! টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা নতি, টাকা গতি! টাকা ধর্ম্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ! ও পথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে, ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে! বম্ বম্ হর হর! টাকা বাড়াও, টাকা বাড়াও, রেইলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থ-প্রসূতি, ও মন্দিরে প্রণাম কর! যাতে টাকা বাড়ে এমন কর; শূন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক! টাকার ঝনঝনিতে ভারতবর্ষ পুরিয়া যাউক্! মন! মন, আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই; টাকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে। টাকাই বাহ্য সম্পদ। হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত; এডাম স্মিথ পুরাণ এবং মিল তন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়; এ উৎসবে ইংরেজি সম্বাদ-পত্র সকল ঢাক ঢোল, বাঙ্গালা সম্বাদ-পত্র কাঁশীদার; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য, এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল, ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক। তবে, আইস, সবে মিলি—

বাহ্য সম্পদের পূজা করি। আইস, যশোগঙ্গার জলে ধৌত বঞ্চনা বিল্বদলে মিষ্টকথা চন্দন মাখাইয়া, এই মহাদেবের পূজা করি। বল, হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা করি। বাজা ভাই ঢাক ঢোল,—ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্! বাজা ভাই কাঁশীদার,—ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং। আসুন পুরোহিত মহাশয়! মন্ত্র বলুন। আমাদের এই বহুকালের পুরাতন ঘৃতটুকু লইয়া স্বধা স্বাহা বলিয়া আগুনে ঢালুন। কোথা ভাই ইউটিলিটেরিয়েন্ কামার! পাঁটা হাড়িকাটে ফেলিয়াছি; একবার বাবা পঞ্চানন্দের* নাম করিয়া, এক কোপে পাচার কর! হর হর বম্ বম্! কমলাকান্ত দাঁড়াইয়া আছে, মুড়িটি দিও! তোমরা স্বচ্ছন্দে পূজা কর!

পূজা কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাকে গোটাকত কথা বুঝাইয়া দাও। তোমার বাহ্য সম্পদে কয়জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয় জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয়জন অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হইয়াছে? কয় জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে? এক জনও না? যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার এ ছাই আমরা চাহি না—আমি হুকুম দিতেছি, এ ছাই ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দাও।

তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই; নহিলে নয়। তোমরা বল যে, এই গর্ত, যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে, আমরা সেই চেষ্টায় আছি। আমি বলি সে মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু উহার অন্ত

* পঞ্চানন্দ আর প্রসিদ্ধ নহে—পঞ্চানন্দই প্রসিদ্ধ। মদ্য, মাংস, গাড়ি, পোষাক, এবং বেশ্যা—এই পাঁচটি আনন্দে এই নূতন পঞ্চানন্দ।

বাড়িতে কাজ নাই। গর্ত্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ যে, আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে। বরং গর্ত্তের এক কোণ খালি থাকে, সেও ভাল, তবু আর আর দিকে একটু মন দেওয়া উচিত। গর্ত্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী; তাহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না? তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না? একটু বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে।

আমি কেবল চিরকাল গর্ত্ত বুজাইয়া আসিয়াছি—কখন পরের জন্য ভাবি নাই। এই জন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি—সংসারে আমার সুখ নাই; পৃথিবীতে আমার থাকিবার আর প্রয়োজন দেখি না। পরের বোঝা কেন ঘাড়ে করিব, এই ভাবিয়া সংসারী হই নাই। তাহার ফল এই যে, কিছুতেই আমার মন নাই। আমি সুখী নহি। কেন হইব? আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি?

সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহ নিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জ্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্যচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রি

যাদি অভ্যাসের বশ; অভ্যাসে এ সকল একেবারে থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে কমলাকান্ত যুক্তকরে সকলের নিকট নিবেদন করিতেছে, তোমরা কেহ কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে পার?

ষষ্ঠ সংখ্যা।

চন্দ্রালোকে।

এই তৃণ-শষ্প-শোভিত সরিৎকূলে, এই কলবাহিনী ভাগীরথী-তীরে, এই স্ফুটচন্দ্রালোকে, আজি দপ্তরের শ্রীবৃদ্ধি, কলেবর-বৃদ্ধি করিব। এইরূপ চন্দ্রালোকেই না, ট্রৈলস শম্মা ট্রয়ের উচ্চ প্রাচীরে আরোহণ করিয়া, ক্রিসীদাকে স্মরণ করিয়া উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতেন। এইরূপ চন্দ্রালোকেই না থিসবী সুন্দরী এইরূপ মৃদু শিশির-পাত-সিক্ত শষ্প মৃদু পদে দলিত করিয়া পিরামসের সঙ্কেত স্থানাভিমুখে অভিসারিণী হইতেন? অভিসারিণী শব্দটিতে অভি একটি উপসর্গ আছে, সৃ একটি ধাতু আছে এবং স্ত্রীত্ববাচক একটি 'ইনী' আছে; এই জীবনে কমলাকান্ত শর্ম্মা কত উপসর্গ দেখিলেন, কত লোকের ছাড়িল পটিল দেখিলেন, কত ইনীও এলেন গেলেন; কি সোপসর্গ ধাতুবিশিষ্ট একটি ইনীও কখন দেখিলাম না

কমলাকান্ত উপসর্গে কোন ইনাঁর ধাতু বিগড়ায়। কমলাভিসারিণী, এরূপ নায়িকা কখন হইল না। যাহারা দুগ্ধ বিক্রয়ার্থ আগমন করে, তাহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতে "পসারিণী" বলিয়াছে, কখন অভিসারিণী বলিয়াছে, এরূপ স্মরণ হয় না, তাহা যদি বলিত, তাহা হইলে অনেক অভিসারিণী দেখিয়াছি বলিতে পারিতাম।

চন্দ্র তুমি হাস্য করিতেছ? হেসে হেসে ভেসে উঠিতেছ? তোমার সাতাইশ ইনী শুদ্ধ আমাকে দেখিয়া, আমার প্রতি চক্ষু টিপিয়া উপহাস করিতেছ? দক্ষ রাজার যেমন কর্ম্ম— একেবারে সাতাইশটিকে এক চন্দ্রে সমর্পণ করিলেন, আর এখন কমলাকান্ত শর্ম্মা বিবাহের জন্য লালায়িত! অমল-ধবল-কিরণরাশি সুধাংশো! আর সকল তোমার থাক্, তুমি অন্ততঃ অশ্লেষা মঘাকে ছাড়িয়া দেও, আমি ওই দুইটিকে বড় ভালবাসি। আমার মত নিষ্কর্ম্মা লোক উঁহাদের কল্যাণে অন্ততঃ দুইদিন গৃহবাসসুখ উপলব্ধি করিতে পারে। আমি ঐ ভগিনীদ্বয়কে আমার ভবনে চিরকাল জন্য স্থান দান করিয়া, সুখে কাল কর্ত্তন করিব। ইহাদিগের আরও অনেক গুণ আছে—লোকে নিজে অক্ষমতা নিবন্ধন কোন কর্ম্ম করিতে না পারিয়া স্বচ্ছন্দে ইহাদিগের দোহাই দিয়া লোকের কাছে আস্ফালন করিতে পারে। আমিও নশীবাবুর কাপড় কিনিতে যদি নির্বুদ্ধিতা বশতঃ প্রতারিত হইয়া আসি, তবে আমার সহধর্ম্মিণী অন্ধে সমস্ত দোষ অর্পণ করিয়া সাফাই করিতে পারিব।

চন্দ্রদেব! তুমি আমার কথায় কর্ণপাত করিলে না? এখনও মন্দাকিনীর মন্দান্দোলিত বক্ষ-বসন করস্পর্শে প্রতিভাসিত

ছি? এখনও মন্দ সমীরণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে পলকে পলকে অলক বর্ষণ করিবে? এখনও তৃণ-ক্ষেত্রে মণি মুক্তা মরকত অকাতরে ছড়াইয়া দিবে? উলুবনে মুক্তা, আর কেহ ছড়াক আর না ছড়াক, দেখিতেছি তুমি ছড়াইয়া থাক। আর আজ আমি ছড়াইব।

এই সংসারের লোক, এই বল্লালসেনের প্র-পৌত্র অপ-পৌত্রেরা এবং তাঁহার মিত্র-ভৃত্য বা অধি-দৌহিত্রেরা আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। আমার বক্ষের উপরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বি, এ, না হলে বিয়ে হয় না। এই বার সংসার ডুবিল। উচ্চ শিক্ষার ফল বি এ ছাপের থাক—রূপার কলসী, গরদের কাচা, এবং স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা, পট্ট-বসনাবৃতা, একটি বংশখণ্ডিকা! [illegible] গুণগ্রাহী পাণ্ডিত্যাভিমানী বি, এ, উপাধিধারী উচ্চশিক্ষিত নব বঙ্গবাসীর, কলসী বস্ত্র বংশ খণ্ডাসমেত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইল!!! * প্রথমে উপাধি পাইয়াছিলেন, এ বার সমাধি পাইলেন। তিনি বিলাতী ব্রহ্মে লীন হইলেন। বঙ্গীয় যুবক সংসারী হইলেন। তাঁহার উচ্চ-শিক্ষা তাঁহাকে তাঁহার চরমধামে পৌঁছিয়া দিয়াছে। তিনি সহস্র তোলক পরিমিত রজতখণ্ড, শত তোলক পরিমিত স্বর্ণালঙ্কার এবং সংসার-কুটীরের এক মাত্র দণ্ডিকা, একটী বংশ-খণ্ডিকা পাইয়াছেন, তিনি তাঁহার চিরবাঞ্ছিত হেমকূট ও নিকটস্থ কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর সরকারি ওকালতী পাইয়াছেন, হরি হরি বল, ভাই! তাঁহার এত দিনে সমাধি হইল!!! তিনি

* বোধ হয় এই ব্যক্তি হইতেই কমলাকান্তের ব্যক্তিত্বের বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।—শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীশ।

উচ্চশিক্ষা লাভার্থ বহু যত্নে কামস্কট্‌কা দেশের নদী সকলের নাম কণ্ঠাগ্রে করিয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি নিশীথ-প্রদীপে অনন্যমনে শাহারা মরুভূমির বালুকাপুঞ্জের সংখ্যা অবধারণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্যই শালিমানের ঊর্দ্ধে বাহান্ন পুরুষ নিম্নে সাড়ে তিপ্‌পান্ন পুরুষের কুলচি মুখস্থ করিয়াছেন। এই উচ্চশিক্ষা-বলে তিনি শিখিয়াছেন যে, টাউনহলে বক্তৃতা করিতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ; ইংরেজের নিন্দা যে কোন প্রকারে করিতে পারিলেই রাজনীতির একশেষ হইল। এবং বংশ-দণ্ডিকার স্থাপন করিয়া উমেদার গোষ্ঠীর বৃদ্ধি করিয়া দেশ জঙ্গলময় করিতে পারিলেই কলির জীবধর্ম্মের চরিতার্থতা হইল।

এরূপ বংশ-দণ্ডিকা-প্রয়াসী আমি নহি। আমি উইল করিয়া যাইব, সাত পুরুষ বিবাহ করিতে না হয় তাও কর্ত্তব্য, তথাপি এরূপ বংশদণ্ডিকা আশ্রয়ে স্বর্গ-প্রাপ্তির বাঞ্ছাও কেহ না করে। যদি জীবপ্রবাহ বৃদ্ধি করাই বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি মৎস্যাদি বিবাহ করিব; যদি টাকার জন্য বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি টাকশালের অধ্যক্ষকে বিবাহ করিব; আর যদি সৌন্দর্য্যার্থে বিবাহ করিতে হয়, তবে—ঘোম্‌টাটানা চাঁদবদনীদের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, ঐ আকাশের চাঁদকে বিবাহ করিব।

ভাগীরথি! যদি তুমি শান্তনুকে অথবা তদপেক্ষা উচ্চতর হিমালয়-ভবনে, অথবা আরো উচ্চতর ধূর্জ্জটীর জটা-কলাপে বিরাজ করিতে, তাহা হইলে কে আজ তোমার উপাসনা করিত? নীচগা হইয়া, মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়া সুবর্ণা, জীবা

সাগরোদ্দেশে গমন করিয়াছিলে বলিয়াই সগর-বংশের উদ্ধার হইয়াছে; সমীরণ! তুমি যদি অঞ্জনার অঞ্চল লইয়া চিরক্রীড়াসক্ত থাকিতে, অথবা মলয়াচলে স্বীয় প্রমোদভবনে চন্দন-শাখা নমিত করিয়া বা এলা লতা কম্পিত করিয়া পরিভ্রমণ করিতে, তাহা হইলে কে তোমাকে "ত্বমেব জগজ্জীবনং পালনং" বলিয়া আর তোমার স্তব স্তুতি করিত? এই বাল-বসন্ত-বিহারী বিহঙ্গমকুলের কাকলি যদি কেবল নন্দন-কাননেই প্রতিধ্বনিত হইত, তাহা হইলে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তাহাদের নাম করিয়া এই রাত্রিকালে স্বীয় মসী লেখনীর অনর্থক ক্ষয় করিবে কেন? সুধাংশো! যদি তুমি ক্ষীরোদ-সাগর-তলে, অমৃত-ভাণ্ডারে, প্রবালপালঙ্কে মৌক্তিক-শয্যায় শায়িত থাকিতে, তাহা হইলে কে তোমার সহিত রমণী মুখ-মণ্ডলের তুলনা করিত? অথবা তোমার ঐ সাতাইশটি ক্রমান্বয় ভজিকা লইয়া খণ্ডর শ্বশুর-মন্দির দক্ষালয়ে বাস করিতে, তাহা হইলে আজি কমল শর্ম্মা কি তোমার দর্শনাভিলাষী হইয়া—এই শ্মশান নিকট বটতলায় উপস্থিত হইয়া বাস করে?

শশী—যদি তোমার ব্যাকরণ পড়া থাকে, তবে আমাকে মাপ করিও, আমি প্রাণান্তেও শশিন্ বলিতে পারিব না—আমি এত ক্ষণ তোমার গুণের অনুধ্যান করিতেছিলাম; শশী, তুমি অনাথার কুটীরদ্বারে প্রহরী রূপে অনিমেষনয়নে বসিয়া থাক, আধভাষী শিশু যখন নাচিতে নাচিতে তোমায় ধরিতে যায়, তুমি তাহার সঙ্গে নাচিতে নাচিতে খেলা কর, বালিকা যখন স্বচ্ছ সরোবর হৃদয়ে তোমায় একবার দেখিতে পাইয়া, একবার না পাইয়া, তোমার অন্বেষণ কামনার্থ, ইতস্ততঃ সরোবরকূলে দৌড়িতে থাকে

তুমি এক এক বার ঈষৎ দেখা দিয়া তাহার সহিত কেবল লুকো-চুরি খেলিতে থাক, নববধূ যখন মন্দ বাত সহিত প্রাসাদোপরি একাকিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকে, তখন তুমি নারিকেল কুঞ্জান্তরাল হইতে অতি ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় ভরিয়া অমৃত-বর্ষণ করিয়া তাহাকে ক্রমে শীতল কর; যখন তরঙ্গিণী আশা-তরঙ্গিত-হৃদয়ে ধীর প্রবাহে মন্দগতিতে সিন্ধু-অভিগামিনী হয়, তখন তুমিই তাহাকে স্বর্ণ-ভূষণে ভূষিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়া থাক; গোলাপ যখন বসন্ত-রাগে এক বৃন্তে চারি দিক দেখিয়া কেলিতে দুলিতে থাকে, তখন তুমিই তাহাকে মালতী লতাকে চুম্বন করিতে কানে কানে পরামর্শ দেও। আবার সেই তুমিই, অসদভিসন্ধিৎসু নর যখন কুলকামিনীর ধর্ম্মনাশে প্রবৃত্ত হয়, তখন তোমার কোমল মুখমণ্ডলে এমনি ভ্রূকুটি করিতে থাক যে, সে তোমার মুখ পানে আর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় না; তুমিই নরহত্যাকারীর তরবারিফলকে বিদ্যুৎ চমকাইয়া দেও, তাহার পাপ শোণিত-বিন্দুতে চৌষট্টি রৌরব প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়া দেও।

তুমি ক্রীড়াশীল শিশুর চলৎ স্বর্ণথালী, তরুণের আশা-প্রদীপ; যুবক যুবতীর যামিনী-যাপনের প্রধান সম্ভোগ-পদার্থ; এবং স্থবিরের স্মৃতি-দর্পণ। তুমি অনাথার প্রহরী, স্থির দীপ-ধারী; তুমি পথিকের পথ-প্রদর্শক; গৃহীর নৈশ-সূর্য্য; তুমি পাপীর পাপের সাক্ষী; পুণ্যাত্মার চক্ষে তাহার যশঃপতাকা; তুমি গগনের উজ্জ্বল মণি; জগতের শোভা। আর এই শ্মশান-বিহারী শ্রীকমলাকান্তের একমাত্র সম্বল; তুমি ভাঙ্গর ভাল, মঙ্গের মন্দ; রসে রঙ্গ, বিরসে বিষ। তুমি কমলাকান্তের

সহধর্ম্মিণী; শশী, আমি তোমায় বড় ভালবাসি, আমি তোমাকেই বিবাহ করিব। সকলে হরি হরি বল, ভাই! আজ এইখানে বাসর যাপন—সকলে একবার হরি বল, ভাই!

বম্ ভোলানাথ! চন্দ্র যে পুরুষ! তবে ডবল মাত্রা চড়াইতে হইল!

চন্দ্র আমাদিগের আর্য্য মতে পুরুষ বটে, কিন্তু বিলাতীয় শর্ম্মাদিগের মতে ইনি কোমলাঙ্গী। আমাদিগের মতে চন্দ্র হি,* ইংরাজি মতে চন্দ্র শী, এখন উপায়? হি কি শী তাহা স্থির হইবে কি প্রকারে?

বাস্তবিক এই বিষয়ে সংসারের লোকের সঙ্গে আমার কখন মতের ঐক্য হইল না। আমার এ বিষয়ে নানা সন্দেহ হয়। যে ওয়াজিদালিশাহা লক্ষৌ নগরী হইতে স্বচ্ছন্দে চতুর্দ্দোলারোহণে মুচিখোলায় আগমন করিয়া, হংস হংসী কপোত কপোতী লইয়া ক্রীড়া করেন, গোলাপ সহিত বারি-হ্রদে নিত্য স্নান করিয়া, শ্রীয়াস্থরূপী পিঞ্জরস্থ বুলবুলিকে সম্বতপলায় প্রদান করেন, তিনি হি না শী? এবং যে মহিষী দেশ-বাৎসল্যে ঐহিক সুখ সম্পত্তি বিসর্জ্জন করিয়া—রাজপুরুষগণের শরণাপন্ন হওয়াপেক্ষা ভিক্ষায় শ্রেয়ঃ বোধে, নেপালের পার্ব্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি শী না হি? তবে কি সাহসকে হি-শীর প্রভেদক করা যায় না। তবে যুদ্ধ-নৈপুণ্যে হি-শীর প্রভেদ হইবে? যে জোয়ান ওর্লিয়ান্স দুর্গ আক্রমণকালে সর্ব্বপ্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল, যে ফ্রান্সের পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, তাহাকে

---

* হি: শী কাহাকে বলে? শুনিয়াছি দুইটি ইংরাজি সর্ব্বনাম—হি পুংলিঙ্গ—শী স্ত্রীলিঙ্গ—শ্রীভীষ্মদেব।

শী বলিব না হি বলিব? আর যে বেড্‌কোর্ড—তাহাকে পাক-
চক্রে ফেলিবার জন্য সেই জোয়ানের কারাগারে পুরুষের
বস্ত্র সংরক্ষণ করিয়াছিল, তাহাকেই বা হি বলিব না শী বলিব?
না যুদ্ধ-কৌশলে বুঝিতে পারিলাম না। তবে শুনা যায় যে
বলীয়ান্, সেই পুরুষ আর যে জাতি দুর্ব্বল, তাহারাই স্ত্রীলোক।
ভাল—কোমৎ আপনাকে নীতিরাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা স্থির করিয়া,
ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট কর যাচ্ঞা করিয়াছিলেন
সেই অতুল প্রতাপশালীকে যে মাদম ক্লোতিলড দেবো
প্রতাপের আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে শী বলিব
বলিব? রোমক [illegible] কৈসরগণ এক এক জন
রাজা, যে মৈসরী রাণী ক্লিওপেটরা এরূপ তিন জন
উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাঁহাকে শী বলিব, না হি
বাস্তবিক জগতে কে হি, কে শী তাহা স্থির করা যায় না
দিন কীর্ত্তন হইতেছিল, যখন কীর্ত্তন-গায়িকা বলিল—
হইয়া শিবাপদ সেবিব?" এবং বঙ্গ নব্য-সম্প্রদায়েরা মন্ত্র
বৎ, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগি
লেন, আমার বাস্তবিক সেই কীর্ত্তন গায়িকাকে সিংহবৎ বোধ
হইয়াছিল এবং সেই সমস্ত বাঙ্গালি যুবককেই আমি শিবা স্বরূপ
মনে করিয়াছিলাম। তখন যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত,
এর কোনগুলি হি, কোন্‌গুলিই বা শী; তাহা হইলে আমি
অবশ্য বলিতাম যে, সেই কীর্ত্তনকারিণীই হি এবং তাঁহার জড়বৎ
শ্রোতৃবর্গই শী। বাস্তবিক বঙ্গীয় যুবকেরা কোথাও হি,
কোথাও শী, এবং সর্ব্বত্র বিকৃতে ইট্ হন। তাহার নিত্য
বিধিই আছে। যথা— ইয়ারকিতে হি, শয্যাগৃহে শী; এবং

বিবয় কর্ম্মে ইট্। তাঁহারা বক্তৃতার সময়ে হন হি, সাহেবের কাছে শী, মদ খাইলে হন ইট্। ফলে ইট্ যাহা হউক, হি, শীর বিষয়ে আমার আপনা আপনি অনেক সন্দেহ হয়। মধু চাটুয্যে আমার নামে সংযোগ করিয়া কি বিদ্রূপ করিয়াছিল বলিয়া, যে প্রসন্ন, স্বচ্ছন্দে পূর্ণদুগ্ধ-কুম্ভ তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া, চাটুয্যের বক্ষ-কবাটের বল পরীক্ষা করণার্থ কোনরূপ শাণিত আয়ুধ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, সে প্রসন্ন রের মতে হইল শী—আর আমি—নশী বাবু কি না এক বলিয়াছিলেন—"যে চক্রবর্ত্তী ঝিমুতে ঝিমুতে আজ নাটা পোড়ালে, এক দিন একটা লঙ্কাকাণ্ড করিবে—সেই ভয়ে আফিঙ্গের মাত্রা কমাইয়া দিলাম, সেই হইলাম হি? এইরূপ বিচারের জন্যই সংসারের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ। ফল কথা, যখন আমি নিজে হি কি হা নিশ্চয় করা দুষ্কর, তখন চন্দ্র হি কিম্বা শী তাহার তা কি প্রকারে হইবে? যদি চন্দ্র হি হয়েন, ত আমি শী—কেন না আমার সহিত চন্দ্রের ভালবাসা জন্মিয়াছে। এবং আমার চন্দ্রকে বিবাহ করিতেই হইবে। আর আমি যদি প্রকৃত এক জন কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী হই, তাহা হইলে চন্দ্র শী; চন্দ্র বিলাতীয় মতে শী। আমি তাহা হইলে চন্দ্রকে বিলাতীয় মতে পাণিগ্রহণ করিব।

এখন নানা মতে নানা কার্য্য হইতেছে; আমি বিলাতীয় মতে বিবাহ করিব। এখন দশাবতার দশকর্ম্মান্বিত হইয়াছেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ টেবিলের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছেন। নৃসিংহরাম কমলাকান্তরূপ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদগণের আশ্রয়ীভূত হইয়াছেন।

বামনাবতারে বঙ্গীয় যুবকগণ, আমার সোণারচাঁদ শশীকে স্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা করে। প্রথম রামের স্থানে ইহারা মাতৃ সেবা, দ্বিতীয় রামের স্থানে পত্নী-সেবা, এবং শেষ রামের নিকটে বারুণী-সেবা শিক্ষা করিয়াছেন। ইহারা বৌদ্ধ-মতে সংসারের অনিত্যতা স্থির করিয়া, কল্কিমতে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এখনকার কালে শাক্তমতে ভোজ্য প্রস্তুত হইয়া, তাহা শৈব ত্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয়; তাহার পর সৌর পান সেবনীয়। আবার কিন্তু শয়নের প্রথম গৌরাঙ্গের উপদেশ মত ভজনশালা করিতে হয়। যেমন গৌরাঙ্গ নবদ্বীপ-বাসীর মত হরিসংকীর্ত্তন করিতে হয়, রাধানগরের ছোট গোসাঞের মত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতে হয়।

সুতরাং শশী, পূর্ণশশী, আজি আমি তোমাকে ইংরাজি মতে, শ্রী স্থির করিয়া, হোস্ বাকালে সুস্থ শরীরে, খোস্ তবিয়তে ইচ্ছা পূর্ব্বক বিবাহ করিলাম। আমি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে অন্যের বিনা শরিকতে তোমাকে ভোগ দখল করিতে থাকিব। ইহাতে তুমি কিম্বা তোমার স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন কোন আপত্তি কর বা করে, তাহা নামঞ্জুর হইবে। তোমার সাতাইশ-টিতে আজ হইতে আমার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার হইল।

আর অমন করিয়া, পা টিপিয়া, পা টিপিয়া, চলে পড়িয়া রোহিণীর সঙ্গে কথা কহিলে কি হইবে? আর অমন করে মুচকে হেসে পাতলা মেঘের ঘোমটা টেনে ভর্ ভর্ করিয়া কত দূর চলিয়া যাইবে? ইতি কোর্টশিপ্ সমাপ্ত:—

একণে গান্ধর্ব্ব বিবাহ। আমি বরমাল্য প্রদান করিলাম, তুমি বরমাল্য প্রদান কর।

> কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা, বরকর্ত্তা বর।
> নিজ মন পুরোহিত, শ্মশানে বাসর॥

এক বার হরি বল, ভাই! হরি হরি বোল।

আজ অবধি আর চন্দ্রকে দেখিয়া কমল মুদিত হইবে না। কমল ফুল্ল হইতে দেখিলে আর চন্দ্র ম্লান হইবে না। এই বার ভারতবর্ষীয় কবিগণের কবিত্ব লোপ হইল—পূর্ব্বে

> কমল মুদিত আঁখি চন্দ্রেরে হেরিলে,
>
> এখন
>
> চন্দ্রেরে দেখিতে দেখ কমল আঁখি মিলে।

> চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল,
>
> কিন্তু
>
> কমল হৃদয়ে চন্দ্র কেবল উজ্জ্বল।

আহা! আমি আমার চন্দ্রকে হারাইয়া দিয়াছি। বর বড় না, কনে বড়, এই দেখ বর বড়—

> চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়,
> চক্রবর্ত্তী পরিপূর্ণ এত কাঁদি কলায়।
> সেই কলা কভু পূর্ণ [illegible] বর্ত্তমান।
> কমলের বাগানের সব [illegible]!

দেখ শশী এখন নির্জ্জন হইল। তোমাকে গোটাকত কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

তুমি তোমার রূপ-গৌরবে গর্ব্বিতা হইয়া যেখানে সেখানে ও রূপের ছড়াছড়ি করিও না। যখন পুত্র-শোকাতুরা মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া তোমার দিকে লক্ষ্য করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন তুমি তাহার কাছে রূপ দেখাইয়া কি

করিবে? তখন কলঙ্কিনি! তোমার রূপরাশি গাঢ় [illegible] লুক্কায়িত করিয়া রাখিও। যখন সংসার জালাজালে [illegible] দগ্ধ হইয়া তোমার দরবারে আসিয়া অভিযোগ করিবে, তখন তোমার সৌন্দর্য্য-বিকাশ তাহার কাছে করিও না; যে সংসার-দগ্ধ, তাহার পক্ষে সে সৌন্দর্য্য তীব্র বিদ্রূপ-ক্ষেপ রূপ হইবে। বরং রক্তরাগে তাহার সহিত আলাপ করিও। যে সকলকে ঘৃণা করিয়াছে, কাহারও প্রীতি সে সহ্য করিতে পারে না। আর যে ঐহিক চরম সুখের সীমা উপলব্ধি করিয়া অন্ত-নির্ব্বাণে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে আর বৃথা আশা দিয়া সান্ত্বনা করিও না। তুমি এক্ষণে আমার এক-জ্যোৎস্না, তুমি আর কি দেখাইয়া আমাকে সান্ত্বনা করিবে? কিন্তু কমলাকান্তের সময় অসময় নাই। ঘটন বিঘটন নাই, সুখ দুঃখ নাই। তুমি সর্ব্বদাই আমার নিকট আসিবে; তোমার নিজকথা আমাকে বলিবে, আমার কথা শুনিয়া যাইয়া, আপনার অঙ্গে আপনার অস্থি-মজ্জার সহিত সেই কথা মিশাইয়া, রাখিয়া দিবে। তুমি জ্যোৎস্না রাত্রিতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিবে. ও কোমল কান্তি লইয়া অন্ধকারে বিচরণ করিও না; অদ্য আমাদের যে সুখের দিন, তাহা তুমি আমি ব্যতীত কে বুঝিতে পারিবে? অদ্য হইতে মাস গণনা করিয়া প্রতি মাসের শেষে আমরা এই গঙ্গাতীরে শপ-বাসর সমাপন করিব। সকল পূর্ণ মাসেই তুমি হঠাৎ আমার কাছে আগমন করিও না; পঞ্জিকা-কারগণের সহিত দিন ক্ষণের পরামর্শ করিয়া কমলাভিসারিণী হইও, নচেৎ এক দিন রাহু তোমাকে পথিমধ্যে হঠাৎ মসীময়ী করিয়া ক্লিষ্ট করিবে। আর এই বিবাহ-রাত্রিতে নব বধূকে

দেশ প্রদান করিতে গেলে ধর্ম্ম-বাজকতার ভান হয়।

ং অলমতিবিস্তরেণ।

এখন এক বার,

কমল শশীর বাসর ঘরে,
ডাক রে কোকিল পঞ্চম স্বরে।

এখন শশী একবার এই মর্ত্ত্য লোকে অবতীর্ণ হইয়া তরঙ্গের উপর অপ্সরা-ছাঁদে নৃত্য কর দেখি! এক বার কাল মেঘের ভিতর বেগে দৌড়াইয়া গিয়া, এক বার অনন্ত গগনের অনন্ত পথে উল্টাইয়া পড় দেখি! এক বার গভীর মেঘে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রন্ধ্র-পথে এক চক্ষু দিয়া আমার দিকে মধুর দৃষ্টিপাত কর দেখি! এক বার নক্ষত্রে নক্ষত্রে কলহ বাধাইয়া দিয়া, তাহারা যেমন পরস্পর সংগ্রাম করিতে আসিবে, অমনি তাহাদের উভয় দলের ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া বেগে ধাবিত হও দেখি! এক বার দ্রুত সঞ্চালনে শ্রান্তি বোধ করিয়া মুক্তা-বিনিন্দিত স্বেদবিন্দুসিক্ত কপালে ঘোমটা তুলিয়া দিয়া গগন গবাক্ষে স্থির দৃষ্টিতে বসিয়া বায়ু সেবন কর দেখি! এক বার অজস্র সুধাবর্ষণ করিয়া চকোরচক্রের অপরিতৃপ্ত রসনার তৃপ্তি সাধন কর দেখি; এক বার শুভক্ষণে কমলাকান্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হও, কমলাকান্ত শয়ন করিল।

শশী, তুমি ক্ষীরোদ-সাগরজা, ত্রিভুবন-বিহারিণী হইয়াও বালিকা-স্বভাব-সুলভ অভিমানের ভজনা করিলে? কমলাকান্ত কোন্ দোষে দোষী বলিতে পারি না—কখন এক বার স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-জটিলতা-জাল-ছেদনার্থ উদাহরণচ্ছলে প্রসন্নর নাম করিয়াছিলাম বলিয়া, এত অভিমান আজিকার রজনীতে ভাল

দেখায় না। দেখ, তুমি কলঙ্কিনী, তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া অদ্যাবধি Lunatic* নাম ধরিলাম। জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া থাকেন, তুমি পাষাণী—তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তাঁহারা বলেন, তোমাতে মনুষ্যত্ব নাই, তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তবু রাগ?—তবে এই সংসার-গরল-খণ্ডন, এই গিরি-তরু-শিরসি-মণ্ডন, ঐ কর লেখা আমার মাথায় তুলিয়া দাও। পার যদি, ঐ অনন্তনীল বৃন্দাবনে, মেঘের ঘোমটা একবার টানিয়া, একবার রাই মানিনী হইয়া বসো! আমি এক বার স্ত্রীলোকের পায়ে ধরিয়া এ জড়জীবন সার্থক করিয়া লই।† আজি আমি শত দোষে দোষী হইলেও তোমা হইতেই আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তুমি আমার চান্দ্রায়ণের চন্দ্র-ফলক! আমার বৈতরণীর নবীন বৎস।

এমন করিলে আমি শত সহস্র বিবাহ করিব। এখন কমলাকান্ত নূতন বিবাহের রীতি পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছে। কমল এখন স্বয়ং বর, কর্ত্তা, পুরোহিত, ঘটক হইতে শিখিয়াছে। কমল এখন যেখানে সেখানে বিবাহ করিতে পারে। যখন দেখিব, নব পল্লবিকা শাখা-স্কন্ধ হইতে মুখ বাড়াইয়া করপত্র সঞ্চালনে আহ্বান করিতেছে, তখনই আমি তাহাকে বিবাহ করিব। যখন দেখিব পদ্মমুখী স্বচ্ছ সরসী-দর্পণে আপনার মুখ বঙ্কিম গ্রীবায় নিরীক্ষণ করিয়া হাসিতেছে, তখনই

---

* চন্দ্রগ্রস্ত, চাঁদে পাওয়া বা পাগল।

† আমি জানি কমলাকান্ত একদিন প্রসন্ন গোয়ালার পায়ে ধরিয়াছেন। কিন্তু সে দুধের জন্য।—শ্রীভীষ্মদেব।

স্থলকমলে, জলকমলে মিশাইয়া দিব। যখন দেখিব, নির্ঝরিণী রামধনুক ধরিয়া আনিয়া তাহাই লোফালুফি করিয়া খেলা করিতেছে, তখনই তাহাকে সেই ধনুঃ স্পর্শ করাইয়া শপথ দিয়া আমার সঙ্গিনী করিয়া লইব। যখন দেখিব, অনন্ত শয্যায় স্বর্ণদী মণিভূষায় শ্বেতাম্বরে ভূষিত হইয়া উত্তর দক্ষিণ শয়নে নিদ্রা যাইতেছে, তখনই তাহাকে পাণিগ্রহণে ধীরে ধীরে জাগরিত করিয়া অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী করিব। যখন দেখিব, কুঞ্জলতা কানে ঝুম্‌কা দোলাইয়া শ্যাম চিকুররাশি চারি দিকে ছড়াইয়া নিস্তব্ধভাবে মৃদু সৌর কিরণে ঈষত্তপ্ত হইতেছে, তখনই তাহার কেশগুচ্ছ মধ্যে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া তাহার ঝুম্‌কা সরাইয়া দিয়া তাহার বরকে চিনাইয়া দিব। কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী এখন বিবাহ করিতে শিখিল, ঘটকালী শিখিল, আর কাহারও উপাসনা করিবে না। যদি তোমরা আমার পরামর্শে কাজ কর, ত আমার মত বিবাহ কর—আমি বেশ ঘটকালী জানি, তোমাদের মনের মত সামগ্রী মিলাইয়া দিব।

সপ্তম সংখ্যা।

বসন্তের কোকিল।

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণে বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক, বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালি ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।

রাগ করিও না—তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেকে আছে। যখন নসী বাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন তাঁহার গৃহকুঞ্জ পূরিয়া যায়—কত টিকি, কোঁটা,

তেজি, চসমার হাট ভাঙ্গিয়া যায়,— কত কবিতা, শ্লোক, গীত চোটা ইংরেজি, মেটো ইংরেজি, চোরা ইংরেজি, ছেঁড়া ইংরেজিতে নসী বাবুর বৈঠকখানা পারাবত-কাকলি-সংকুল গৃহসৌধবৎ শব্দিত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাটীতে নাচ, গান, যাত্রা, পর্ব্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে বসন্তের কোকিল আসিয়া, তাঁহার ঘর বাড়ী আঁধার করিয়া তুলে—কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাশে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাথা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়। যখন নসী বাবু বাগানে যান তখন মানুষ কোকিল, তাঁহার সঙ্গে পিপীড়ার সারি দেয়। আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নসী বাবুর পুত্রটি অকালে মারা পড়িল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও অসুখ, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও বড় দুঃখ, একটি নাতি হইয়াছে, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না। কেহ সমস্ত দিন ঘরে বিনাহারে অভিভূত, এজন্য আসিতে পারিলেন না। আসল কথা, সে দিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সেদিন আসিবে কেন?

সত্য ভাই, বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক। ঐ অশোকের ডালে বসিয়া রাঙ্গা ফুলের রাশির মধ্যে কাল শরীর, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যস্থ কালো সেগুনের মত, লুকাইয়া রাখিয়া, এক বার তোমার ঐ পঞ্চম স্বরে, কুহু বলিয়া ডাক। তোমার ঐ কু—উ রবটি আমি বড় ভালবাসি। তুমি নিজে কালো—পরান্নপ্রতিপালিত, তোমার চক্ষু [illegible]

"কু"—তবে বড় পায়, ঐ পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বল, "কু—উঃ।" যখন এ পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে, তাহাতে তোমার দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষ্যার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, "কু—উ"—কেন না তুমি সৌন্দর্য্য-শূন্য, পরান্নপ্রতিপালিত। যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত পুষ্প-স্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল—তখনই ডাকিয়া বলিও "কু—উঃ।" যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এককালে ফুটিয়া আপনাদিগের গন্ধে আপনারা বিভোর হইয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, তখনই তোমার সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলিও, "কু—উঃ।" যখন দেখিবে বকুলের অতি ঘনবিন্যস্ত মধুরশ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্ররাশির শোভা আর গাছে ধরে না—পূর্ণযৌবনা সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া, উছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে—তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও, এ "কু—উঃ।" যখন দেখিবে, শুভ্র-মুখী, শুদ্ধশরীরা, সুন্দরী নব-মল্লিকা সন্ধ্যা-শিশিরে সিক্ত হইয়া, আলোক প্রাখর্য্যের হ্রাস দেখিয়া, ধীরে ধীরে মুখখানি খুলিতে সাহস করিতেছে—স্তরে [illegible] অসংখ্য অকলঙ্ক দল-রাজি বিকসিত করিবার উপক্রম [illegible]তেছে,—যখন দেখিবে যে, ভ্রমর সেরূপ দেখিয়া—"আদ-[illegible]সারি"—কণ্ঠভরা গুন্ গুন্ মধু ঢালিয়া দিতেছে—[illegible] কালামুখ! আবার "কু—উঃ" বলিয়া ডাকিয়া মনের

জ্বালা নিবাইও। আর যখনই গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গনস্থ দাড়িম্ব-শাখায় বসিয়া, দেখিবে সেই গৃহপুষ্পরূপিণী কন্যাগণে সেই লতার দোলনি, সেই পদ্মরাজের প্রস্ফুটতা, সেই বকুলের রূপোচ্ছাস, সেই মল্লিকার অমলতা একাধারে মিলিত করিয়াছে, তখনই তাহাদের মুখের উপর, ঐ পঞ্চম-স্বরে, গৃহপ্রাচীর প্রতিধ্বনিত করিয়া, সবাইকে ডাকিয়া বলিও, এত রূপ, এত সুখ, এত পবিত্রতা—এ "কু—উঃ!" ঐটি তোমার জিত—ঐ পঞ্চম-স্বর! নহিলে তোমার ও কু—উ কেহ শুনিত না। এ পৃথিবীতে গ্লাডষ্টোন ডিস্রেলি প্রভৃতির ন্যায়,—তুমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে—নহিলে অত কালো চলিত না; তোমার চেয়ে হাঁড়িচাচা ভাল। গলাবাজির এত গুণ না থাকিলে, যিনি বাজে নবেল লিখিয়াছেন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন? আর জন ষ্টুয়ার্ট মিল পার্লিয়ামেণ্টে স্থান পাইলেন না কেন?

তবে, কোকিল, তুমি প্রকৃতির মহা-পার্লিয়ামেণ্টে দাঁড়াইয়া নক্ষত্রময় নীলচন্দ্রাতপমণ্ডিত, গিরিনদীনগরকুঞ্জাদি বেঞ্চে সুসজ্জিত, ঐ মহাসভা-গৃহে, তোমার এ মধুর পঞ্চম-স্বরে—কু—উঃ বলিয়া ডাক—সিংহাসন হইতে হষ্টিংস্ পর্য্যন্ত সকলেই কাঁপিয়া উঠুক। "কু—উঃ!" ভাল, ভাই; ও কলকণ্ঠে কু বলিলে কু মানিব, সু বলিলে সু মানিব। কু বৈ কি? সব কু। লতায় কণ্টক আছে; কুসুমে কীট আছে; গন্ধে বিষ আছে; পত্র শুষ্ক হয়, রূপ বিকৃত হয়, স্ত্রীজাতি বঞ্চনা জানে। কু—উঃ—তুমি গাও। কিন্তু তুমি ঐ পঞ্চম-স্বরে বলিলেই সু ভ্রান্তি নচেৎ কুকড়ো বাবাজি "কু কু কু কু" বলিয়া আমার

প্রভাত নিদ্রাকে কু বলিলে আমি মানিব না। তার গলা নাই। গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চেঁচাইলে হয় না; যদি শব্দ-মন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে—বে-পর্দা বা কড়িমধ্যমের কায নয়। সর্ জেমস্ মাকিন্টশ্, তাঁহার বক্তৃতায় ফিলজফির* কড়িমধ্যম মিশাইয়া হারিয়া গেলেন—আর মেকলে রেটরিকের† পঞ্চম লাগাইয়া জিতিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ঋষভ-স্বর কে শুনে? দেখ লোকের বৃদ্ধ পিতা মাতার বেসুরো বকাবকিতে কোন্ ফল দর্শে? আর যখন বাবুর গৃহিণী বাবুর সুর বাঁধিয়া দিবার জন্য বাবুর কান টিপিয়া ধরিয়া পঞ্চমে গলার আওয়াজ দেন, তখন বাবু পিড়িং পিড়িং বলেন, কি না?

তবে তোমার স্বরকে পঞ্চম-স্বর কেন বলে, তাহা বুঝি না। যাহা মিষ্ট, তাহাই পঞ্চম? দুইটি পঞ্চম মিষ্ট বটে,—সুরের পঞ্চম, আর আল্‌তাপরা ছোট পায়ের গুজরী পঞ্চম। তবে, সুর, পঞ্চমে উঠিলেই মিষ্ট; পায়ের পঞ্চম, পা হইতে নামাইলেই মিষ্ট।

কোন্ স্বর পঞ্চম, কোন্ স্বর সপ্তম, কে মধ্যম, কে গান্ধার আমাকে কে বুঝাইয়া দিবে? এটি হাতীর ডাক, ওটি ঘোড়ার ডাক, সেটি ময়ূরের কেকা, ওটি বানরের কিচিমিচি, এ বলিলে ত কিছু বুঝিতে পারি না। আমি আফিংখোর—বেসুরো জুড়ি, বেসুরো বুঝি, বেসুরো লিখি—ধৈবত গান্ধার নিষাদ পঞ্চমের কি ধার ধারি? যদি কেহ পাখোয়াজ তানপুরা রাখী

* দর্শন। † অলঙ্কার।

হাঁক লইয়া, আমাকে সপ্ত সুর বুঝাইতে আসে, তবে তাহার গর্জ্জন শুনিয়া, মঙ্গলা গাইয়ের সদ্যঃপ্রসূত বৎসের ধ্বনি আমার মনে পড়ে—তাহার পাঁকাবশিষ্ট নির্জ্জল দুগ্ধের অনুধ্যানে মন ব্যস্ত হয়—সুর বুঝা হয় না। আমি গায়কের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্য আশীর্ব্বাদ করি, যেন তিনি জন্মান্তরে মঙ্গলার বৎস হন।

এখন আয়, পাখী! তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে, আমিও সে—সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তুই এই পুষ্পকাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে আপনার আনন্দে গাইয়া বেড়াস্—আমিও এই সংসার-কাননে, গৃহে গৃহে, আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই—আয়, ভাই, তোতে আমাতে মিলে মিশে পঞ্চম গাই। তোরও কেহ নাই—আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই—আনন্দ আছে। তোর পুঁজিপাটা ঐ গলা; আমার পুঁজিপাটা, এই আফিঙ্গের ডেলা; তুই এ সংসারে পঞ্চম-স্বর ভালবাসিস্—আমিও তাই; তুই পঞ্চম-স্বরে কারে ডাকিস্? আমিই বা কারে? বল্ দেখি, পাখী, কারে?

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভাল, তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে তাকেই ডাকি। এই যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি। আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস্। জানিয়া ডাকি না জানিয়া ডাকি, সমান কথা; তুইও কিছু জানিস্ না, আমিও জানি না; তোরও ডাক পৌঁছিবে, আমারও

ডাক পৌঁছিবে। যদি সর্ব্বশব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে, তোর ডাক পৌঁছিবে না কেন? আয়, ভাই, একবার মিশে দুই জনে পঞ্চম-স্বরে ডাকি।

তবে, কুহুরবে সাধা গলায়, কোকিল একবার ডাক্ দেখি রে! কণ্ঠ নাই বলিয়া, আমার মনের কথা কখন বলিতে পাইলাম না। যদি তোর ও ভুবন-ভুলান স্বর পাইতাম, ত বলিতাম। তুই আমার সেই মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া এই পুষ্পময় কুঞ্জবনে একবার ডাক্ দেখি রে! কি কথাটি বলিব বলিব মনে করি, বলিতে জানি না, সেই কথাটি তুই বল্ দেখি রে! কমলাকান্তের মনের কথা, এ জন্মে বলা হইল না—যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই—অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি। ঐ নীলাম্বরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীমধ্যে উড়িয়া, কখন কি কুহু বলিয়া ডাকিতে পাইব না? আমি না পাই, তুই কোকিল আমার হয়ে একবার ডাক্ দেখি রে?

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

অষ্টম সংখ্যা।

স্ত্রীলোকের রূপ।

অনেক ভামিনী রূপের গৌরবে পা মাটিতে দেন না। ভাবেন, যে দিক্ দিয়া অঙ্গ দোলাইয়া চলিয়া যান, লাবণ্যের তরঙ্গে সে দিকের সংজ্ঞা ডুবিয়া যায়; নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের রূপের ঝড় যে দিকে বয়, সে দিকে সকলের ধৈর্য্য-চালা উড়িয়া যায়, ধর্ম্ম-কোটা ভাঙ্গিয়া পড়ে; যখন পুরুষের মন-চড়ায় তাঁহাদের রূপের বান ডাকে, তখন তাহাদের কর্ম্ম-জাহাজ, ধর্ম্ম-পান্সী, বুদ্ধি-ডিঙ্গি, সব ভাসিয়া যায়। কেবল সৌন্দর্য্যাভিমানিনী কামিনীকুলেরই এইরূপ প্রতীতি নহে; পুরুষেরাও যখন মহিলাগণের মোহিনী শক্তির বশীভূত হইয়া তাহাদিগের রূপের মহিমা বর্ণনা করেন, তখন যে তাঁহারাও কি বলেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন গগনের জ্যোতিষ্ক, পৃথিবীর পর্ব্বত, পশু পক্ষী,

কীট পতঙ্গ, লতা গুল্মাদি সকলকেই লইয়া উপমা টানি পাড়ান্--আবার অনেককেই অপমানিত করিয়া রূপসীর মুখমণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহারা পূর্ণ-নিমন্ত্রণ করিয়া, আবার মসীবৎ ম্লান বলিয়া ফেরত পাঠান। গরিব চাঁদ, আপনার কলঙ্ক আপনি বুকে করিয়া রাতারাতি আকাশের কাজ সারিয়া পলায়ন করে। সুন্দরীর ললাটের সিন্দূরবিন্দু দেখিয়া তাঁহারা উষার সীমন্ত-শোভা তরুণ তপনের নিন্দা করেন; রাগে সূর্য্যদেব, পৃথিবী দগ্ধ করিয়া চলিয়া যান। রসময়ীর অধরে হাস্যরাশি অবলোকন করিয়া প্রফুল্ল কমলে সৌর-রশ্মির লাস্য বা বিকসিত কুমুদে কৌমুদীর লতা তাঁহারা আর ভালবাসেন না; সেই অবধি কমল কুমুদে কীট পতঙ্গের অধিকার। কামিনীর কণ্ঠস্বর নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা শিশার তারকামালার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন; বোধ করি, ভবিষ্যতে জ্যোতিষের অনুশীলন ত্যাগ করিয়া, তাঁহারা স্বর্ণকারের বিদ্যায় মন দিবেন। রঙ্গিণীর শরীর সঞ্চালনে তাঁহারা এত লাবণ্যলীলা বিলোকন করেন যে, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মন্দ মন্দ আন্দোলিত বৃক্ষপত্র বা নিয়ত কম্পিত সিন্ধু-হিল্লোলে চন্দ্রিকার খেলায় তাঁহাদিগের আর মন উঠে না। এই জন্যই বা, রাত্রে নিদ্রা যান, এবং নদীকে কলসী কলসী করিয়া ফেলিতে থাকেন। আবার যখন রমণীর নয়ন বর্ণন করেন, তখন সরোবরের মলয়-মারুতে দোদুল্যমান নীলোৎপল দূরে থাকুক, বিশ্বমণ্ডলের কিছুই তাঁহাদিগের ভাল লাগে না।

এই নারীমূর্ত্তির স্তাবককুলের উপমাচ্ছন্নশক্তির কিছু প্রশংসা করিতে হয়। এক চক্ষু তাঁহাদিগের কমলাকান্তের

যথা খঞ্জন, চকোর; কখন মৎস্য, যথা শফরী; উদ্ভিদ, যথা পদ্ম, পদ্মপলাশ, ইন্দীবর, কখন জড় পদার্থ, আকাশের তারা। এক চন্দ্র, কখনও রমণীর মুখমণ্ডল, কখনও তাহার পায়ের নখর।* উচ্চ কৈলাস-শিখর, এবং ক্ষুদ্র কোমল কোরক, একেরই উপমাস্থল; কিন্তু ইহাতেও কুলায় না বলিয়া দাড়িম্ব, কদম্ব, করিকুম্ভ এই বিষম উপমাস্থলে বদ্ধ হইয়াছে। জলচর ক্ষুদ্র পক্ষী হংস, এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ হস্তী, ইহাদিগের গমনে বৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক উপলব্ধি; কিন্তু কবিদিগের চক্ষে উভয়েই রমণী-কুল-চরণ-বিন্যাসের অনুকারী। আবার যে সে হাতীর গমনের সহিত, এই হংসগামিনীদিগের গমনসাদৃশ্য নির্দ্দেশ করা বিধেয় নহে; যে হাতী হাতীর রাজা, সেই হাতীর সঙ্গেই গজেন্দ্রগামিনীগণের গতি তুলনীয়। শুনিয়াছি হাতী, এক দিনে অনেক দূর যাইতে পারে; অশ্বাদি কোন পশু তত পারে না। যাঁহাদিগকে দূরে যাইতে হয়, তাঁহারা এই গজেন্দ্রগামিনীদিগের পিঠে চড়িয়া যান না কেন? যে দিকে রেইলওয়ে হয় নাই, সে দিকে বাছিয়া বাছিয়া গজগামিনী মেয়ের ডাক বসাইলে কেমন হয়?

আমিও এক কালে কামিনীভক্ত কবিদলভুক্ত ছিলাম। আমি তখন এই অখিল সংসারে রমণীর ন্যায় সুন্দর বস্তু আর দেখিতে পাইতাম না। চম্পক, কমল, কুন্দ, বন্ধুজীব, শিরীষ, কদম্ব, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পচয় তখন কামিনী-কান্তি-গ্রথিত

---

* আমার বিবেচনায় চন্দ্রের সহিত নখরের তুলনা অতি সুন্দর—কেমন বা উত্তম পদবিন্যাস হইতে পারে—যথা নখরনিকর-হিমকর-করা[illegible] কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীরে।—এটি আমার নিজের রচনা।—শ্রীভীষ্মদেব।

কুসুম-মালিকার ন্যায় মনোহর বোধ হইত
বসন্তের কুসুমবতী বসুমতী অপেক্ষাও আমি কুসুম
ভালবাসিতাম; বর্ষার উচ্ছ্বসিত-সলিলা তরঙ্গিণী
অপেক্ষাও রসবতী যুবতীর পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু এক্ষণে
আর আমার সে ভাব নাই। আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে।
আমি মায়াময়ী মানবীমণ্ডলের কুহক-জাল ছিন্ন করিয়া বাহির
হইয়া পলায়ন করিয়াছি। জালিয়ার পচা জালে রাঘব বোয়াল
পড়িলে, যেমন জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি
পলায়ন করিয়াছি; ক্ষুদ্র মাকড়সার জালে যেমন গুবরে পোকা
পড়িলে জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন
করিয়াছি; দুরন্ত গোরু, এক বার দড়ি ছিঁড়িতে পারিলে
যেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, আমি তেমনি দৌড় মারিয়া
পলায়ন করিয়াছি। সকলই আফিমের প্রসাদে! হে মাতঃ
আফিম দেবি! তোমার কৌটা অক্ষয় হৌক। তুমি বৎসর
বৎসর সোণার জাহাজে চড়িয়া চীন দেশে পূজা খাইতে যাও।
জাপান, সাইবিরিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, সকলই তোমার
অধিকারভুক্ত হৌক; তোমার নামে দেশে দেশে দুর্গোৎসব
হউক। কমলাকান্তকে পায়ে রাখিও। আমি তোমার কৃপায়
সাধারণের উপকারার্থে নিজের মন খুলিয়া দুই চারিটি কথা
বলিব।

শুনিয়া কেবল স্ত্রীলোকে কেন, অনেক পুরুষেও
আমাকে পাগল বলিবেন। বলুন। ক্ষতি নাই। নূতন কথা
যে বলে, সেই প্রথমে পাগল বলিয়া গণ্য হয়। গালিলিও* বলিলেন,

* [illegible]

ইতালীয় ভদ্র সমাজ, ধার্ম্মিক সমাজ, শুনিয়া হাসিলেন; শুনিয়া স্থির করিলেন, ওর মতিভ্রম হইয়াছে। কালের স্রোত বহিয়া গেল। তালীয় ভদ্র সমাজ, ধার্ম্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ, আর পৃথিবী ঘুরিতেছে শুনিলে হাসেন না; গালিলিওকে আর মতিভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।

সকলে সৌন্দর্য্য বিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য স্বীকার করেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পাইয়াও, রূপের টীকা স্ত্রীলোকের মস্তকে দেন। আমার বিবেচনায় এটি মস্ত ভুল। আমি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছি যে, পুরুষের রূপ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রূপ অনেক দূর নিকৃষ্ট। হে মানময়ী মোহিনীগণ! কুটিল কটাক্ষে কালকূট বর্ষণ করিয়া আমাকে এই দোষে দগ্ধ করিও না; কালসর্পী-বিনিন্দিত বেণীদ্বারা আমাকে বন্ধন করিও না, ভ্রূ ধনুকে কোপে তীক্ষ্ণ শর যোজনা করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিও না। বলিতে কি তোমাদের নিন্দা করিতে ভয় করে। পথ বুঝিয়া যদি তোমরা নত-ফাঁদ পাতিয়া রাখ, তবে কত হস্তী বদ্ধচরণ হইয়া, তোমাদের নাকে ঝুলিতে পারে—কমলাকান্ত কোন্ ছার! তোমাদের নথের দোলক খসিয়া পড়িলে, মানুষ খুন হইবার অনেক সম্ভাবনা; চন্দ্রহারের একখানি চাঁদ যদি স্থানচ্যুত হইয়া কাহারও গায়ে লাগে, তবে তাঁহার হাত পা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা রাগ করিও না। আর হে রমণীপ্রিয়, কল্পনাপ্রিয়, উপমাপ্রিয় কবিগণ, তোমাদিগের স্ত্রীদেবীর সুখময়ী সুখদেবী প্রতিমা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তোমরা আমাকে মারিতে উদ্যত

হইও না। আমি সপ্রমাণ করিয়া দিব যে, তোমরা কুসংস্কারাবিষ্ট পৌত্তলিক। তোমরা উপাস্য দেবতার প্রকৃত মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃত প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিতেছ।

যাহার সুন্দর কেশপাশ আছে, সে আর পরচুলা ব্যবহার করে না। যাহার উজ্জ্বল ভাল দাঁত আছে, তাহার কৃত্রিম দন্তের প্রয়োজন হয় না। যাহার বর্ণে লোকের মন হরণ করে, তাহার আর রং মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে হয় না। যাহার নয়ন আছে, তাহার আর কাচের চক্ষুর আশ্রয় লইতে হয় না। যাহার চরণ আছে, তাহাকে আর কাষ্ঠপদ অবলম্বন করিতে হয় না। এইরূপ যাহার যে বস্তু আছে, সে তাহার জন্য লালায়িত হয় না। যে বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতি কোন পদার্থে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই তদ্বিষয়ে আপনার অভাব মোচনার্থে যত্ন করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত অভাব। তাহারা সর্ব্বদা আপন আপন রূপ বাড়াইতে ব্যস্ত; কি উপায়ে আপনাকে সুন্দরী দেখাইবে, ইহা লইয়াই উন্মাদিনী; ভাল ভাল অলঙ্কার কিসে পাইবে, নিয়ত ইহাই তাহাদিগের ভাবনা, ইহাই তাহাদিগের চেষ্টা; এমন কি, বলা যাইতে পারে যে, অলঙ্কারই তাহাদিগের জপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের তপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের ধ্যান, অলঙ্কারই তাহাদিগের জ্ঞান। স্বীয় দেহ সজ্জিত করিতে এত যাহাদিগের যত্ন, তাহাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে অধিক আছে, এরূপ বোধ হয় না। যাহার নাক সুন্দর নহে, সেই নাকে নথরূপ বস্তুতে লোকজনসমাজকে ভোলায়। যাহার কান সুন্দর নহে, সেই

ঢাকাই-কানরূপ নানা ফলফুল পশুপক্ষিবিশিষ্ট বাগানের বোঝা কানে ঝুলাইয়া দেয়। যাহার হৃদয় ভাল নহে, সেই সেখানে সাতনর কাঁসির দড়ি টাঙ্গাইয়া পুরুষজাতির, বিশেষতঃ গুম্ফ পারী বালকদিগের প্রীতি বিধান করে। যে অলঙ্কার বিনাও আপনাকে সুন্দরী বলিয়া জানে, সে কখন অলঙ্কারের বোঝা বহিতে এত ব্যগ্র হয় না। পুরুষে ভূষণ বিনা সন্তুষ্ট থাকে; স্ত্রীলোকে ভূষণ বিনা মনুষ্যসমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়। অতএব স্ত্রীলোকদিগের নিজের ব্যবহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি সৌন্দর্য্য বিষয়ে নিকৃষ্ট।

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতির সৌন্দর্য্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি-পদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রককলাপ দেখিয়া জলদমুকুট ইন্দ্রধনু হারি মানে, সে চন্দ্রককলাপ ময়ূরের আছে; ময়ূরীর নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর নাই। যে ঝুটিতে বৃষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কুটের যেমন সুন্দর তাম্রচূড়া ও পক্ষ সকল আছে, কুক্কুটীর তেমন নাই। এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী। মনুষ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। হে দাগ্রী "বিদ্যাসুন্দর"-কার। তোমার মনে কি এই তত্ত্বটি উদিত হইয়াছিল? এজন্যই কি তুমি নায়কের নাম সুন্দর রাখিয়াছিলে? তুমি কি বুঝিয়াছিলে যে, স্ত্রীলোক যত কেন বিদ্যাধরী হউক না, পুরুষের [illegible]

সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধির নিকটে তাহাকে পরাভব স্বীকার হইবে।

সৌন্দর্য্যের বাহার যৌবনকালে। কিন্তু, রূপান্ধ ভামিনীগণ! তোমাদিগের যৌবন কতক্ষণ থাকে? জোয়ারের জলের মত আসিতে আসিতেই যায়। কুড়ি হইলেই তোমরা বুড়ী হইলে। অল্প দিনের মধ্যেই তোমাদিগের অঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়ে। বয়স আসিয়া শীঘ্রই তোমাদিগের গলার লাবণ্যমালা ছিঁড়িয়া লয়। চাল্লিশ পঁয়তাল্লিশে পুরুষের যে শ্রী থাকে, বিশ পঁচিশের ঊর্দ্ধে তোমাদিগের তাহা থাকে না। তোমাদিগের রূপের স্থিতি সৌদামিনীর ন্যায়, ইন্দ্রধনুর ন্যায়, মুহূর্ত্তেক জন্য না হউক, অত্যল্প কালের জন্য সন্দেহ নাই। যাহারা রূপভোগে উন্মত্ত, আমি আহারে বসিলেই তাহাদের যন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারি;—আমার জীবনে ঘোর দুঃখ এই যে, অন্ন ব্যঞ্জন পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তেমনি, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যরূপ খুকুড়ি চালের ভাত, প্রণয়-কলাপাতে ঢালিতে ঢালিতে ঠাণ্ডা হইয়া যায়—আর কাহার সাধ্য খায়? শেষে বেশভূষা রূপ তেঁতুল মাখিয়া, একটু আদর লবণের ছিটা দিয়া, কোনরূপে গলাধঃকরণ করিতে হয়।

হে সৌন্দর্য্যগর্ব্বিত কামিনীকুল! সত্য করিয়া বল দেখি, এই রূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই কি তোমাদিগের রূপের এত আদর? ভাল করিয়া দেখিতে, না দেখিতে, ভাল করিয়া উপভোগ করিতে না করিতে, অন্তর্হিত হইয়া যায় বলিয়া, তোমাদিগের রূপের জন্য কি পুরুষেরা পিপাসিত চাতকের ন্যায় উন্মত্ত? অপরিজ্ঞাত হীরাখণ্ড বলিয়াই কি তোমরা উহার প্রকৃত মূল্য

অপরঞ্চ প্রণয় কেবল রূপগ্রাহী পদার্থ বলিয়া নয়, অপর
কারণেও স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করে। যে
সকল গ্রন্থকারদিগের মত ভূমণ্ডলে গ্রাহ্য হইয়াছে, তাঁহারা
সকলেই পুরুষ এ কারণে আমার বিবেচনায় অনুরাগনেত্রে
কামিনীকুলের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কথাই আছে, "যার
যাতে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।" যে রমণীগণ প্রণয়ের
পদার্থ, তাহাদিগকে কে সহজ চক্ষুতে দেখিবে? সুন্দর মুকুরের
প্রভাবে দৃষ্ট বস্তু কুৎসিত হইলেও সুন্দর দেখাইবে। মনো-
মোহিনীর রূপ নিরীক্ষণকালে তাহাকে প্রীতির অঞ্জনে মাখাইয়া
দেখিব। পুরুষাপেক্ষা তাহার মাধুর্য্য কেন না অধিক বোধ
হইবে?

হে প্রণয়দেব, পাশ্চাত্য কবিরা তোমাকে অন্ধ বলিয়াছেন।
কথাটা মিথ্যা নয়। তোমার প্রভাবে লোকে প্রিয় বস্তুর দোষ
দেখিতে পায় না। তোমার অঞ্জনে যাহার নেত্র রঞ্জিত হইয়াছে,
সে বিশ্ব বিমোহন পদার্থ-পরম্পরায় পরিবৃত থাকে। বিকট
মূর্ত্তিকে সে মনোহর দেখে। কর্কশ স্বরকে সে মধুময় ভাবে।
প্রেয়সীর অঙ্গ-ভঙ্গীকে মৃদু-মন্দ-মারুতে দোদুল্যমানা ললিত-
লবঙ্গলতার লাবণ্যলীলা অপেক্ষাও সুখকরী জ্ঞান করে।
এজন্যই চীনদেশে খাঁদা নাকের আদর। এজন্যই বিলাতী
বিবিদের রাঙ্গা চুল ও বিড়াল চোকের আদর। এজন্যই কাফ্রি-
দেশে স্থূল ওষ্ঠাধরের আদর। এজন্যই বাঙ্গালাদেশের চিত্র-
চিত্রিত মিশি-কলঙ্কিত চাঁদবদনের আদর। এজন্যই মানবসমাজে
স্ত্রীরূপের আদর। আর যদি স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় অনেক
কথা মুখে আনিতেন, তাহা হইলে, হে প্রণয়দেব, তিনিও তবে

হউক না হউক, অন্ততঃ তোমার গুণেও আমরা শুনিতে পাইলাম যে, পুরুষের সৌন্দর্য্যের কাছে স্ত্রীলোকের রূপ কিছুই নয়। যদিও অন্তরের গুপ্ত ভাব বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করিতে মহিলাগণ অত্যন্ত সঙ্কুচিতা, তথাপি কার্য্যদ্বারা তাহাদিগের আন্তরিক গূঢ় তত্ত্বগুলি কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কে না দেখিয়াছে যে, সুন্দরীরা পরস্পরের সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে চাহেন না, অথচ পুরুষের ভক্ত হইয়া বসেন? ইহাতে কি বুঝাইতেছে না যে, মনে মনে তাঁহারা স্ত্রীলোকের রূপাপেক্ষা পুরুষের রূপের পক্ষপাতিনী?

রূপ, রূপ, করিয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ভাবে রূপই কামিনীকুলের মহামূল্য ধন, রূপই কা[illegible] সর্ব্বস্ব। সুতরাং মহিলাগণ যাহা কিছু কাম্য ব[illegible] করেন, লোকে কেবল রূপের বিনিময়েই দিতে চায় মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গনাবর্গের সৃষ্টি। ইহা[illegible] মধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব।

অস্থায়ী সৌন্দর্য্যই যোষিদ্‌মণ্ডলীর এক মাত্র [illegible] সাগর পার হইবার একমাত্র কাণ্ডারী, এ[illegible] শুনিতে চাহি না। অনেক দিন শুনি[illegible] ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। শুনিতে শুনিতে চাই যে, নারীজাতির রূপ, লক্ষ গুণে, কোটী গুণে অপে[illegible] চাই যে তাঁহা [illegible]

আত্মীয়বর্গের সেবা শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা কামিনীকুলের সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। যাঁহারা কখন কোন সুন্দরীকে পতি পুত্রের জন্ত জীবন বিসর্জ্জন, ধর্ম্মের জন্ত বাহ্যসুখ বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা কিয়দ্দূর বুঝিয়াছেন যে, কি রূপ প্রীতি ও ভক্তি স্ত্রীহৃদয়ে বসতি করে।

যখন আমি উৎকৃষ্টা যোষিদ্বর্গের বিষয়ে চিন্তা করিতে যাই, তখনই আমার মানস-পটে, সহমরণপ্রবৃত্তা সতীর মূর্ত্তি গিয়া উঠে। আমি দেখিতে পাই যে, চিতা জ্বলিতেছে, পদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে দিয়া আছেন। আস্তে আস্তে বহ্নি বিস্তৃত হইতেছে, দগ্ধ করিয়া অপর অঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। অগ্নি- রণ ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হরিবোল বলিতে বা সঙ্কেত করিতেছেন। দৈহিক ক্লেশ-পরিচায়ক। আনন প্রফুল্ল। ক্রমে পাবকশিখা বাড়িল, ল, কায়া ভস্মীভূত হইল। ধন্য সহিষ্ণুতা! ধন্য ভক্তি!

ভাবি যে, কিছু দিন হইল আমাদিগের দেশীয়া বলাঙ্গী হইয়াও এইরূপে মরিতে পারিত, আশার সঞ্চার হয়, তখন আমার আমাদিগের অন্তরেও নিহিত আছে। পাইতে পারিব না? হে বঙ্গ শের তোমাদের

নবম সংখ্যা

ফুলের বিবাহ।

বৈশাখ মাস বিবাহের মাস। আমি ১লা বৈশাখে নসী বাবুর ফুলবাগানে বসিয়া একটি বিবাহ দেখিলাম। ভবিষ্যৎ বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থ লিখিয়া রাখিতেছি।

মল্লিকা ফুলের বিবাহ। বৈকাল শৈশব অবসান প্রায়, কলিকা কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া আসিল। কন্যার পিতা বড় লোক নহে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ, তাহাতে আবার অনেকগুলি কন্যাভারগ্রস্ত। সম্বন্ধের অনেক কথা হইতেছিল, কিন্তু কোনটা স্থির হয় নাই। উদ্যানের রাজা স্থলপদ্ম নির্দ্দোষ পাত্র বটে, কিন্তু ঘর বড় উঁচু, স্থলপদ্ম অত দূর নামিল না। জবা, এ বিবাহে অসম্মত ছিল না, কিন্তু জবা বড় রাগী, কন্যাকর্ত্তা পিছাইলেন। গান্দাজি পাত্র ভাল, কিন্তু বড় দেমাগ, প্রায় তাঁহার বাড় পাড়িয়া

এইরূপ অব্যবস্থার সময়ে ভ্রমররাজ ঘটক হইয়া বৃক্ষসদনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, "গুণ্! গুণ্! গুণ্! মেয়ে আছে?"

মল্লিকাবৃক্ষ পাতা নাড়িয়া সায় দিলেন, "আছে!" ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "গুণ্ গুণ্ গুণ্! গুণ্ গুণা-গুণ্! মেয়ে দেখিব।"

বৃক্ষ, শাখা নত করিয়া, মুদিত নয়না অবগুণ্ঠনবতী কন্যা দেখাইলেন।

ভ্রমর, একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, "গুণ্! গুণ্! গুণ্! গুণ দেখিতে চাই। ঘোমটা খোল।"

লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোমটা খুলে না। বৃক্ষ বলিলেন, "আমার মেয়েগুলি বড় লাজুক। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মুখ দেখাইতেছি।"

ভ্রমর ভোঁ করিয়া স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিয়া রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ারকি করিতে বসিলেন। এ দিকে মল্লিকার সন্ধ্যা ঠাকুরাণী দিদি আসিয়া তাহাকে কত বুঝাইতে লাগিল—বলিল, "দিদি, এক বার ঘোমটা খোল—নইলে, বর আসিবে না—লক্ষ্মী আমার, চাঁদ আমার, সোণা আমার" ইত্যাদি। কলিকা কত বার ঘাড় নাড়িল, কত বার রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইল, কত বার বলিল, "ঠান্‌দাদি, তুই যা!" কিন্তু শেষে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া মুখ খুলিল। তখন ঘটক মহাশয় ভোঁ করিয়া রাজবাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালীতে মন দিলেন। কন্যার পরিমলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্, গুণাগুণ! কন্যা গুণবতী বটে। তবে মধু কই?"

কন্যাকর্ত্তা বৃক্ষ বলিলেন, "কর্ম্ম দিবেন, কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিব।" ভ্রমর বলিলেন, "গুণ্ গুণ্, আপনার অনেক গুণ্—ঘটকালীটা ?"

কন্যাকর্ত্তা শাখা নাড়িয়া সায় দিল, "তাও হবে।"

ভ্রমর—"বলি ঘটকালীর কিছু আগাম দিলে হয় না ? অগ্রদান বড় গুণ—গুণ গুণ গুণ।"

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরক্ত হইয়া, সকল শাখা নাড়িয়া বলিল, "আগে বরের কথা বল—বর কে ?"

ভ্রমর—"বর অতি সুপাত্র।—তাঁর অনেক গুণ্-ন্ ন্।"

"কে তিনি ?"

"গোলাবলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অনেক—গুণ্-ন্—ন্।"

এ সকল কথোপকথন মনুষ্যে শুনিতে পায় না, আমি কেবল আফিম প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ পাইয়াই, এ সকল শুনিতে-ছিলাম। আমি শুনিতে লাগিলাম, কুলাচার্য্য মহাশয়, পাখা ঝাড়িয়া, ছয় পা ছড়াইয়া গোলাবের মহিমা কীর্ত্তন করিতে-ছিলেন। বলিতেছিলেন যে, গোলাব বংশ বড় কুলীন; কেন না ইহারা "ফুলে" মেল। যদি বল সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব অধিক, কেন না ইহারা সাক্ষাৎ বাগমালীর সন্তান ; তাহার স্বহস্তরোপিত। যদি বল ঐ ফুলে কাঁটা আছে, কোন্ কুলে বা কোন ফুলে নাই ?

যাহা হউক, ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির করিয়া ভোঁ করিয়া উড়িয়া গিয়া, গোলাব বাবুর বাড়ীতে খবর দিলেন। গোলাব, তখন বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া

আহ্লাদিত হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিল। ভ্রমর বলিল, "আজি কালি ফুটিবে।"

গোধূলি লগ্ন উপস্থিত, গোলাপ বিবাহযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উচ্চিংড়া নহবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল, মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাত কাণা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না। খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল; আকাশে তারাবাজি হইতে লাগিল। কোকিল আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল। অনেক বরযাত্র চলিল, স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাবসানে অসুস্থ বলিয়া আসিতে পারিলেন না, কিন্তু জবা গোষ্ঠী—শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা প্রভৃতি সবংশে আসিয়াছিল। করবী সব দলে, সেকেলে রাজাদিগের মত বড় উচ্চ ডালে চড়িয়া সভায় উপস্থিত হইল। সেঁউতি নীতবর হইবে বলিয়া, সাজিয়া আসিয়া দুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়া চাঁপা আসিয়া দাঁড়াইল—বেটা ব্রাহ্মণ টানিয়া আসিয়াছে, উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা বড় বাহার দিয়া, দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল। অশোক, নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে এক পাল পিপড়া মোসাহেব হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জ্বালা বড়—কোন্ বিবাহে না এরূপ বরযাত্র জোটে, আর কোন্ বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া বিবাদ বাঁধায়? কুরুবক, কুটজ প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্র আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের কাছে তাঁহাদের পরিচয় শুনিবেন। নথরই ঝিঁঝি যাতায়াত করেন এবং কিছু কিছু মধু পাইয়া থাকেন।

আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম। দেখি বরপক্ষের বড় বিপদ্। বাতাস্, বাহকের বায়না লইয়াছিলেন; তখন হুঁ—হুম্ করিয়া অনেক মর্দানি করিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের সময়ে কোথায় লুকাইলেন, কেহ খুঁজিয়া পায় না। দেখিলাম বর, বরযাত্র, সকলে অবাক্ হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। মল্লিকাদিগের কুল যায় দেখিয়া, আমিই বাহকের কার্য্য স্বীকার করিলাম। বর,বরযাত্র সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম।

সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভগিনী, আহ্লাদে ঘোমটা খুলিয়া, মুখ ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি, গন্ধের ভাণ্ডারে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে—রূপের ভরে সকলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যূথি, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধ প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী-আচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম, পুরোহিত উপস্থিত; নশীবাবুর নবমবর্ষীয়া কন্যা (জীবন্ত কুসুমরূপিণী) কুসুমলতা সূচ সূতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কন্যাকর্ত্তা কন্যা সম্প্রদান করিলেন; পুরোহিত মহাশয় দুই জনকে এক সূতায় গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন।

তখন বরকে বাসর-ঘরে লইয়া গেল। কত যে রসময়ী মধুময়ী সুন্দরী সেখানে বরকে ঘেরিয়া বসিল, তাহা কি বলিব। প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর শাদা প্রাণে বাঁধা রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গণের, রাঙ্গা মুখে হাসি ধরে না। যূথি, কন্যের সই, কন্যের কাছে গিয়া শুইল; রজনীগন্ধকে বর [illegible] বলিয়া কত তামাসা করিল; বকুল একে রসিকা, তাতে বড় গুণ, তত রূপ নহে; এক কোণে [illegible] রূপ

করিয়া বসিয়া রহিল; আর ঝুমকা ফুল বড় মানুষের গৃহিণীর মত মোটা মাগী লাল শাড়ী ছড়াইয়া ঝমকাইয়া বসিল। তখন—

"কমলাকাকা—ওঠ বাড়ী যাই—রাত হয়েছে, ওকি ঢুলে পড়বে যে?"

কুসুমলতা এই কথা বলিয়া আমার গা ঠেলিতেছিল;—চমক হইলে দেখিলাম কিছুই নাই। সেই পুষ্পবাসর কোথায় মিশিল? মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই বটে—এই আছে এই নাই। সে রম্য বাসর কোথায় গেল—সেই [illegible] সামগ্রী ফুলসুন্দরী সকল কোথায় গেল? যেখানে সব যাইবে, সেইখানে—স্মৃতির দর্পণতলে; [illegible]। যেখানে রাজা প্রজা পর্ব্বত সমুদ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি গিয়াছে বা যাইবে, সেইখানে—ধ্বংসপুরে! এই বিবাহের ন্যায় সব শূন্যে মিশাইবে, সব বাতাসে গলিয়া যাইবে—কেবল থাকিবে কি? ভোগ? না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে পারে না। তবে কি? স্মৃতি?

কুসুম বলিল, "ওঠ না—কি কচ্চো?"

আমি বলিলাম, "ফুল পাগলি আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম।"

কুসুম খেসে এসে, হেসে হেসে কাছে দাঁড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার বিয়ে, কাকা?"

আমি বলিলাম, "ফুলের বিয়ে?"

"ওঃ পোড়া কপাল, ফুলের? আমি বলি কি। আমিও যে এই ফুলের বিয়ে দিয়েছি।"

"কই?"

"এই যে মালা গাঁথিয়াছি।" দেখিলাম সেই মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে।

দশম সংখ্যা।

বড় বাজার।

প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আমি নসীরাম বাবুর গৃহে আসিয়া অবধি তাহার নিকট ক্ষীর সর, দধি দুগ্ধ এবং নবনীত খাইতেছি। আহার-কালে মনে করিতাম, প্রসন্ন কেবল পরলোকে সদ্গতির কামনায় অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে;—জানিতাম, সংসারারণ্যে যাহারা পুণ্যরূপ মৃগ ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বেড়ায়, প্রসন্ন তন্মধ্যে সুচতুরী; ভোজনান্তে নিত্যই প্রসন্নের পরকালে অক্ষয় স্বর্গ, এবং ইহকালে ঘোতাক্ত বৃদ্ধির জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতাম। কিন্তু এক্ষণে হায়! মানব-চরিত্র কি ভীষণ স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত! এক্ষণে সে মূল্য চাহিতেছে!

সুতরাং তাহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা। প্রথম দিন যে দিন মূল্য চাহিল, রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিলাম—

দ্বিতীয় দিনে বিস্মিত হইলাম—তৃতীয় দিনে গালি দিয়াছি। এক্ষণে সে দুধ দই বন্ধ করিয়াছে। কি ভয়ানক! এত দিনে জানিলাম, মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর; এতদিনে জানিয়াছি যে, যে সকল আশা ভরসা সযত্নে হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া বিশ্বাসজলে পুষ্ট কর, সকলই বৃথা! এক্ষণে জানিয়াছি যে, ভক্তি প্রীতি স্নেহ প্রণয়াদি সকলই বৃথা গন্ধ—আকাশ-কুসুম! ছায়াবাজি! হায়! মনুষ্যজাতির কি হইবে! হায়, অর্থলুব্ধ গোয়ালা জাতিকে কে নিস্তার করিবে! হায়! প্রসন্ন নামে গোয়ালার কবে গোরু চুরি যাবে!

প্রসন্নের দুগ্ধ দধি আছে, সে দিবে, আমার উদর আছে, খাইব, তাহার সঙ্গে এই সম্বন্ধ, ইহাতে সে মূল্য চাহে কোন্ অধিকারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। প্রসন্ন বলে, আমি অধিকার অনধিকার বুঝি না; আমার গোরু, আমার দুধ, আমি মূল্য লইব। সে বুঝে না যে, গোরু কাহারও নহে; গোরু, গোরুর নিজের; দুধ, যে খায় তারই।

তবে এ সংসারে মূল্য লওয়া একটা রীতি আছে, স্বীকার করি। কেবল খাদ্য সামগ্রী কেন, সকল সামগ্রীই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। দুধ, দই, চাল দাল, খাদ্য পেয়, পরিধেয় প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য দূরে থাকুক, বিদ্যা বুদ্ধিও মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। কালেজে মূল্য দিয়া বিদ্যা কিনিতে হয়। অনেকে ভাল কথা মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকেন। হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম্ম কিনিয়া থাকেন। যশঃ মান অতি অল্প মূল্যেই ক্রীত হইয়া থাকে। ভাল সামগ্রী মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে, ইহাও কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু মনুষ্য এমনই মূল্যপ্রিয় যে, ইহা না

মন্দ সামগ্রীও কেহ কাহাকে দেয় না। যে বিষ খাইয়া মরিবার বাসনা কর, তাহাও তোমাকে বাজার হইতে মূল্য দিয়া, কিনিয়া খাইতে হইবে।

অতএব এই বিশ্বসংসার, একটি বৃহৎ বাজার—সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি। সকলেই অনবরত ডাকিতেছে, "আমার দোকানে ভাল জিনিষ—খরিদ্দার চলে আয়"—সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, খরিদ্দারের চোকে ধূলা দিয়া রদি মাল পাচার করিবে। দোকানদার খরিদ্দারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাঁকি দিতে পারে। সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনের দুঃখে আফিমের মাত্রা চড়াইলাম। তখন জ্ঞাননেত্র ফুটিল। সম্মুখে ভবের বাজার সুবিস্তৃত দেখিলাম। দেখিলাম, অসংখ্য দোকানদার, দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে—অসংখ্য খরিদ্দারে খরিদ করিতেছে—দেখিলাম, সেই অসংখ্য দোকানদারে অসংখ্য খরিদ্দারে পরস্পরকে অসংখ্য অঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে। আমি গামছা কাঁধে করিয়া বাজার করিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই রূপের দোকানে গেলাম। যে জিনিষ ঘরে নাই, সেই দোকানে আগে যাইতে হয়।—দেখিলাম যে, সংসারের সেই মেছো হাটা। পৃথিবীর রূপসীগণ মাছ হইয়া ঝুড়ি চুপড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। দেখিলাম, ছোট বড় রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, চুনো পুঁটি, কই, মাগুর, [illegible] জল ছেড়ে আছড়াইয়া ধড় ফড় করিতেছে [illegible] কত [illegible] জন্য খাবি খাইতেছে।—

একজনীয়া ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো! কুল পুকুরের সস্তা মাছ, অমনি ছেড়ে দেবো—বোঝা বিক্রী হলেই বাঁচি।" কেহ ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো—ধন সাগরের মিঠা মাছ—যে খেয়েছে তার পুনর্জন্ম হয় না—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিবিধ সুখে পরিণত হইয়া তার সব বাগে ছড়াছড়ি যায়, যার সাধ্য থাকে কিনিবে। সোণার হাঁড়িতে চোখের জলে সিদ্ধ করিয়া, হৃদয়-আগুনে কড়া জ্বাল দিয়া রাঁধিতে হয়—কে খরিদ্দার সাহস করিস্—আয়। সাবধান! হীরার কাঁটা—নাতি বাঁটা—গলায় বাঁধলে শাশুড়ীরূপী বিড়ালের পায়ে পড়িতে হয়—কাঁটার জ্বালায়, খরিদ্দার বলে কি গলায়!" কেহ ডাকিতেছে, "ওরে আমার সরস পুঁটি, বিক্রী হলেই উঠি। ঝোলে ঝালে অম্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাতে দিবে ফেলে, রামা যাবে চলে,—সংসারের দিন সুখে কাটাবে, আমার এই সরস পুঁটির গুণে।" কেহ বলিতেছে—"কাদা ঘেঁটে চাঁদা এনেছি—দেখে খরিদ্দার পাগল হয়! কিনে নিয়ে ঘর আলো কর।"

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া মাছ কিনিতে প্রবৃত্ত হইলাম—কেন না আমার নিরামিষ ঘর কন্না। দেখিলাম, মাছের দালাল আছে; নাম পুরোহিত। দালাল খাড়া হইলে দর জিজ্ঞাসা করিলাম—শুনিলাম, দর "জীবন সর্বস্ব।" যে মাছ ইচ্ছা সেই মাছ কেন, একই দর, "জীবন সর্বস্ব।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, এ মাছ কত দিন থাকিবে?" দালাল বলিল, "দুদিন চারি দিন, তার পর পচিয়া গন্ধ হইবে।" জিজ্ঞাসিলাম "এত চড়া দরে, এমন নশ্বর সামগ্রী কেন কিনিব?" [illegible]

মেছো হাটা হইতে পলায়ন করিলাম। দেখিয়া মেছুনীরা গামছা কাঁধে মিন্‌সেকে গালি পাড়িতে লাগিল।

রূপের বাজার ছাড়িয়া বিদ্যার বাজারে গেলাম। দেখিলাম, এখানে ফলমূল বিক্রয় হয়। এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুলি কোঁটা-কাটা টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ তসর গরদ পরিয়া, নামাবলি গায়ে, ঝুনা নারিকেলের দোকান খুলিয়া বসিয়া খরিদ্দার ডাকিতেছেন—"বেচি আমরা ঘটত্ব পটত্ব বহু পত্ব—ঘরে চাল থাকিলেই ঘ-ত্ব, নহিলে ন-ত্ব। দ্রব্যত্ব জাতিত্ব গুণত্ব পদার্থ—বাপের শ্রাদ্ধে বিদায় না দিলেই তুমি বেটা অপদার্থ। পদার্থ-তত্ত্ব নামে ঝুনা নারিকেল—খাইতে বড় কঠিন—তাহার প্রথম ছোবড়ায় লেখে যে, ব্রাহ্মণীই পরম পদার্থ। অভাব ... নারিকেল চতুর্ব্বিধ*—তোমার ঘরে ধন আছে, আমার নাই, ইহা অন্যোন্যাভাব। যতক্ষণ না পাই ততক্ষণ প্রাগভাব খরচ হইয়া গেলেই ধ্বংসাভাব; আর আমাদের ঘরে সর্ব্ব অত্যন্ত অভাব। অভাব নিত্য কি অনিত্য যদি সংশয় থা তবে আমাদের ভাণ্ডারে উঁকি মার—দেখিবে, নিত্যই অভ অতএব আমাদের ঝুনা নারিকেল কেন। ব্যাপ্য, ব্যাপ-ব্যাপ্তি, এ নারিকেলের শাঁস, ব্রাহ্মণের হস্ত হইল ব্যাপ্য, রজত হইল ব্যাপক; আর তুমি দিলেই ঘটিল ব্যাপ্তি; এই ঝুনা নারিকেল কেন, এখনই বুঝিবে। দেখ, বাপু, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বড় গুরুতর কথা; টাকা দাও, এখনই একটা কাগ

* নৈয়ায়িকেরা বলেন, অভাব চতুর্ব্বিধ, অন্যোন্যাভাব, প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, আর অত্যন্তাভাব।

শ্রীকমলাকান্ত।

হইবে, কম দিলেই অকার্য্য। আর কারণ বুঝাইব কি, এই যে দুই প্রহর রৌদ্রে ঝুনা নারিকেল বেচিতে আসিয়াছি, ব্রাহ্মণীই তাহার কারণ—কিছু যদি না কেন, তবে নারিকেল লহ,—অকারণ। অতএব নারিকেল কেন, নহিলে এই ঝুনা নারিকেল মাথায় ঠুকিয়া মরিব।"

ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রখর তপনতপ্ত ঘর্ম্মাক্ত ললাট এবং বাগ্বিতণ্ডাজনিত অধর সুধাবৃষ্টি দেখিয়া দয়া হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ঝুনা নারিকেল কিনিতে আপত্তি নাই, কিন্তু দোকানে দা আছে? ছুলিবে কি প্রকারে?"

"না বাপু, দা রাখি না।"

"তবে নারিকেল ছোল কিসে?"

"আমরা ছুলি না—আমরা কামড়াইয়া ছোবড়া খাই।"

শুনিয়া, আমি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া পাশের দোকানে গেলাম।

দেখিলাম, ইহাদিগের সম্মুখেই এক্সপেরিমেণ্টেল সায়েন্সের দোকান। কতকগুলি সাহেব দোকানদার, ঝুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভৃতি ফল বিক্রয় করিতেছেন। ঘরের উপরে বড় বড় পিতলের অক্ষরে লেখা আছে।

MESSRS BROWN JONES AND
ROBINSON
NUT SUPPLIERS
ESTABLISHED 1757
ON THE FIELD OF PLASSEY.

MESSRS BROWN JONES AND ROBINSON,
offer to the Indian Public
A Large Assortment of
NUTS.
PHYSICAL, METAPHYSICAL,
LOGICAL, ILLOGICAL,
AND
SUFFICIENT TO BREAK THE JAWS
AND
DISLOCATE THE TEETH OF
ALL INDIAN YOUTHS
WHO STAND IN NEED OF HAVING THEIR
DENTAL SUPERFLUITIES CURTAILED.

দোকানদার ডাকিতেছেন—"আয় কালা বালক Experimental Science খাবি আয়। দেখ, ১নম্বর এক্সপেরিমেণ্ট—ঘুসি; ইহাতে দাঁত উপড়ে, মাথা ফাটে এবং হাড় ভাঙ্গে। আমরা এ সকল এক্সপেরিমেণ্ট বিনামূল্যে দেখাইয়া থাকি—পরের মাথা বা নরম হাড় পাইলেই হইল। আমরা স্থূল পদার্থের সংযোগ বিয়োগ সাধনে পটু—রাসায়নিক বলে, বা বৈদ্যুতীয় বলে, বা চৌম্বুক বলে, জড়পদার্থের বিশ্লেষণেই সুদক্ষ—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মুষ্ট্যাঘাতের বলে মস্তকাদির বিশ্লেষণেই আমরা কৃতকার্য্য। মাধ্যাকর্ষণ, যৌগিকাকর্ষণ, চৌম্বুকাকর্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ আকর্ষণের কথা আমরা অবগত আছি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কেশাকর্ষণেই আমরা কৃতবিদ্য। এই সংসারে জড়পদার্থের নানাবিধ যোগ দেখা যায়; যথা বায়ুতে অম্লজান্

ও যবক্ষারজানের সামান্য যোগ, জলে জলজান ও অম্লজানের রাসায়নিক যোগ, আর তোমাদিগের পৃষ্ঠে, আমাদের হস্তে, মুষ্টিযোগ। অতএব, এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে যদি, মাথা বাড়াইয়া দাও; এক্সপেরিমেণ্ট করিব। দেখিবে, গ্রাবিটেশ্যনের বলে এই সকল নারিকেলাদি তোমাদের মস্তকে পড়িবে; পর্কশন্ নামক অদ্ভুত শাব্দিক রহস্যেরও পরিচয় পাইবে, এবং দেখিবে, তোমার মস্তিকস্থিত স্নায়ব পদার্থের গুণে তুমি বেদনা অনুভূত করিবে।

অগ্রিম মূল্য দিও; তাহা হইলে চ্যাবটিতে এক্সপেরিমেণ্ট খাইতে পারিবে।"

আমি এই সকল দেখিতে শুনিতেছিলাম, এমত সময়ে, সহসা দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকানদারেরা লাঠী হাতে, দ্রুত বেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনা নারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া, নামাবলী ফেলিয়া, মুক্তকচ্ছ হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবেরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া, বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া সুখে আহার করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "একি হইল?" সাহেবেরা, "ইহাকে বলে, Asiatic Researches." আমি তখন ভীত হইয়া, আত্মশরীরে কোন প্রকার Anatomical researches আশঙ্কা করিয়া, সেখান হইতে পলায়ন করিলাম।

সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন, বুঝিলাম, ইহা সংস্কৃত সাহিত্য; দেখিলাম, আর কতকগুলি মহুয়া লীচু পীচ পেয়ারা আনারস

আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—বুঝিলাম, এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কিসের দোকান?

বালকেরা বলিল, "বাঙ্গালা সাহিত্য।"

"বেচিতেছে কে?"

"আমরাই বেচি। দুই একজন বড় মহাজনও আছেন। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পত্রাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।"

"কিনিতেছে কে?"

"আমরাই।"

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।

তাহার পরে কলু পটিতে গেলাম। দেখিলাম, বড় উমেদার, মোসাহেব সকলে কলু সাজিয়া তেলের ভাঁড় লইয়া সারি সারি বসিয়া গিয়াছে। তোমার ট্যাঁকে চাকরি আছে, শুনিতে পাইলেই, পা টানিয়া লইয়া, ভাঁড় বাহির করিয়া, তেল মাখাইতে বসে। চাকরি না থাকিলেও—যদি থাকে, এই ভরসায়, পা টানিয়া লইয়া, তেল লেপিতে বসে। তোমার কাছে চাকরি নাই—নাই নাই—নগদ টাকা আছে ত—আচ্ছা, দাও—তেল দিতেছি। কাহারও প্রার্থনা, তোমার বাগানে দি দর্শন প্রাপ্তি থাইবে, আমি তোমার চরণে তৈল আমার কন্যার বিবাহটি যেন হয়। কাহারও আকাঙ্ক্ষা,

তোমার কানে অবিরত খোসামোদের গন্ধ তৈল ঢালিব—বাড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে পারি। কাহারও কামনা,তোমার তোষাখানার বাতি জ্বালিয়া দিব—আমার খবরের কাগজখানি যেন চলে। শুনিয়াছি কলুদিগের টানাটানিতে অনেকের পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। আমার শঙ্কা হইল, পাছে কোন কলু আফিঙ্গের প্রার্থনায় আমার পায়ে তেল দিতে আরম্ভ করে। আমি পলায়ন করিলাম।

তার পরে যশের ময়রাপটী। সম্বাদপত্রলেখক নামে ময়রা-গণ, গুড়ে সন্দেশের দোকান পাতিয়া, নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে—রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ গছাইয়া দিয়া, হাত পাতিতেছে—মূল্য না পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে। এ দিকে তাঁহাদের বিক্রেয় যশের দুর্গন্ধে পথিক নাসিকা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতেছে। দোকানদারগণ বিনা ছানায়, শুধু গুড়ে, আশ্চর্য্য সন্দেশ করিয়া সস্তা দরে, বিক্রয় করিতে-ছেন। কেহ টাকাটা সিকেটায় আনা দু আনায়, কেহ কেবল খাতিরে—কেহ বা এক সাঁজ ফলাহার পেলেই ছাড়েন—কেহ বা বাবুর গাড়িতে চড়িতে পেলেই যশোবিক্রয় করেন। অন্যত্র রাজপুরুষগণ মিঠাইওয়ালা সাজিয়া, রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর খেতাব, খেলাত, নিমন্ত্রণ, ধন্যবাদ প্রভৃতি মিঠাই লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া আছেন,—চাঁদা, সেলাম, খোষামোদ, ডাক্তার-খানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বেচিতেছেন। বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত—কেহ সর্ব্বস্ব দিয়া এক ঠোঙ্গা পাইতেছে না—কেহ শুধু সেলামে পেট মন লইয়া যাইতেছে।

অনেক দোকান দেখিলাম—কিন্তু সর্ব্বত্রই পচা মাল।

বিক্রয় হইতেছে—খাঁটি দোকান দেখিলাম না। কেবল একখানি দোকান দেখিলাম—তাহা অতি চমৎকার।

দেখিলাম দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের উত্তর পাইলাম না—কেবল এক সর্ব্বপ্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম—অল্পালোকে দ্বারে ফলক-লিপি পড়িলাম।

যশের পণ্যশালা।
বিক্রেয়—অনন্ত যশ।
বিক্রেতা—কাল।
মূল্য—জীবন।

জীবন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না।
আর কোথাও সুযশ বিক্রয় হয় না।

পড়িয়া ভাবিলাম—আমার যশে কাজ নাই—কমলাকান্তের প্রাণ বাঁচিলে অনেক যশ হইবে।

বিচারের বাজারে গেলাম—দেখিলাম সেটা কসাইখানা। টুপি মাথায়, শামলা মাথায়—ছোট বড় কসাই সকল, ছুরি হাতে গোরু কাটিতেছে। মহিষাদি বড় বড় পশু সকল শৃঙ্গ নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে;—ছাগ মেষ এবং গোরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশু সকল ধরা পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়া একজন কসাই বলিল, "এও গোরু, কাটিতে হইবে।" আমি সেলাম করিয়া পলাইলাম।

আর বড় বাজার বেড়াইবার সাধ রহিল না—তবে প্রসন্নের উপর রাগ ছিল বলিয়া একবার জইয়েহাটা দেখিতে লাগিলাম—

গিয়া প্রথমেই দেখিলাম যে সেখানে খোদ কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী নামে গোয়ালা—দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি লইয়া বসিয়া আছে—আপনি ঘোল খাইতেছে, এবং পরকে খাওয়াইতেছে।

তখন চমক হইল—চক্ষু চাহিলাম—দেখিলাম, নশী বাবুর বাড়ীতেই আছি। ঘোলের হাঁড়ি কাছে আছে বটে। প্রসন্ন এক হাঁড়ি ঘোল আনিয়া আমাকে সাধিতেছে—"চক্রবর্ত্তী মশাই—রাগ করিও না। আজ আর দুধ দই নাই—এই ঘোলটুকু আনিয়াছি—ইহার দাম দিতে হইবে না।"

একাদশ সংখ্যা।

আমার দুর্গোৎসব।

সপ্তমীপূজার দিন কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল! আমি কেন আফিঙ্গ খাইলাম! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখন দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল!

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-

প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে, হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—দিগ্ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কাল স্রোতোমধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

কোথায় ফুল পাইলাম বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম, "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে, আমার সর্ব্বার্থ সাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুলপালিকে! ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ, দুঃখদায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি প্রীতি বৃত্তি শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি এই অনন্তজলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই [illegible]

বিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎ সমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি নববলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি!—এসো মা, গৃহে এসো—ছয়কোটি সন্তানে একত্রে, এক কালে, দ্বাদশকোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয়কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধু-সেবিতে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধু-মথনকারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান—তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কালসমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্ত করে, সজল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা—একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননি!

না। উঠিলেন না। উঠিবেন না কি?

এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র সকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধুম বাঁধিবে। মেষক ছাগকে হাড়িকাটে ফেলিয়া সংকীর্ত্তি পড়ো মায়ের কাছে বলি দিব—কত পুরাবৃত্তকার ঢাকী, ঢাক ঘাড়ে করিয়া, বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কাঁসি, কাড়া, নাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে "কত নাচ গো।—" বড় পূজার ধূম বাঁধিবে। কত ব্রাহ্মণপণ্ডিত লুচি মণ্ডার লোভে বঙ্গপূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে—কত দেশ বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামি দিবে—কত দীন দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে। কত নর্ত্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্তে ডাকিবে মা! মা! মা!—

জয় জয় জয় জয়া জয়দাত্রি।
জয় জয় জয় বঙ্গ জগদ্ধাত্রি॥
জয় শুভে শুভদে সুখদে বরদে।
জয় [illegible] বরদে শর্ম্মদে॥

জয় জয় জয় শুভে শুভঙ্করি।
জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমঙ্করি॥
বেদকমলিনি, সন্তানপালিনি।
জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি॥
জয় জয় লক্ষ্মি বারীন্দ্রবালিকে।
জয় জয় কমলাকান্তপালিকে॥
জয় জয় ভক্তিশক্তিদায়িকে।
পাপতাপভয়শোকনাশিকে॥
মৃদুল গম্ভীর ধীর ভাষিকে।
জয় মা কালি করালি অম্বিকে॥
জয় হিমালয় নগবালিকে।
অতুলিত পূর্ণচন্দ্র ভালিকে॥
শুভে শোভনে সর্ব্বার্থসাধিকে।
জয় জয় শান্তি শক্তি কালিকে॥
জয় মা কমলাকান্তপালিকে॥
নমোস্তু তে দেবি বরপ্রদে শুভে।
নমোস্তু তে কামচরে সদা ধ্রুবে॥
ব্রহ্মাণীব্রাণি রুদ্রাণি ভূতভব্যে যশস্বিনি।
ত্রাহি মাং সর্ব্বদুঃখেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করি॥
নমোস্তু তে জগন্নাথে জনার্দ্দিনি নমোস্তু তে।
প্রিয়দান্তে জগন্মাতঃ শৈলপুত্রি বসুন্ধরে॥
ত্রায়স্ব মাং বিশালাক্ষি ভক্তানামার্ত্তিনাশিনি।
নমামি শিরসা দেবীং বন্ধনোত্তবিমোচিতঃ॥*

* [illegible] বেদ।

দ্বাদশ সংখ্যা

একটি গীত।

"শোন্ প্রসন্ন, তোকে একটি গীত শুনাইব।"

প্রসন্ন গোয়ালিনী বলিল, "আমার এখন গান শুনিবার সময় নয়—দুধ যোগাবার বেলা হলো।"

কমলাকান্ত। "এসো এসো বঁধু এসো।"

প্রসন্ন। "ছি ছি ছি! আমি কি তোমার বঁধু?"

কমলাকান্ত। "বালাই! ষাট, তুমি কেন বঁধু হইতে যাইবে? আমার গীতে আছে"—

এসো এসো বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো—

সুর করিয়া আমি কীর্ত্তন ধরাতে প্রসন্ন দুধের কেঁড়ে রাখিয়া বসিল, আমি গীতটি আদ্যোপান্ত গায়িলাম।

"এসো এসো, বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।

অনেক দিবসে, মনের মানসে,
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।।
মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ॥
বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।"

মিল ত চমৎকার, "দেখি" আর "বিধি" মিলিল! কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, এইরূপ মোহ মন্ত্র আর একটি শুনিব, মনে বড় সাধ রহিয়াছে। যখন এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই—মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি দৈববংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর—শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, ই মুরলীতে, একা এই গীত গাই—এই গীত কখন ভুলিতে [illegible]রিলাম না; কখন ভুলিতে পারিব না।

"এসো এসো বঁধু এসো" *

লোকের মনে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি [illegible]মলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, বুঝিতে পারি না যে, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে

* পাঠককে গীতের মধ্যে মিলাইয়া দেখিতে হইবে।

কিছু সুখ আছে। যে পাঠক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি জন্য পরসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন কখন কমলাকান্ত শর্ম্মার দপ্তর-মুক্তাবলী পড়িতে বসে না। আমি বিলাসপ্রিয়ের মুখে "এসো এসো বঁধু এসো" বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংবাদ, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্যহৃদয়কামনা। মনুষ্য হৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি সকল শরীর রক্ষার্থ—মহতী প্রবৃত্তি সকলের উদ্দেশ্য, "এসো এসো বঁধু এসো।" তুমি চাকরি কর, পরিবার জন্য—কিন্তু যশের আকাঙ্ক্ষা কর, পরের অনুরাগ লাভ করিবার জন্য, জনসমাজের হৃদয়কে তোমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য। তুমি যে পরোপকার কর, সে পরের দুঃখের ক্লেশ আপন হৃদয়ে অনুভূত কর বলিয়া। তুমি যে রাগ কর, সে তোমার মনোমত কার্য্য হইল না বলিয়া; হৃদয় হৃদয়ে আসিল না বলিয়া। সর্ব্বত্র এই রব—"এসো এসো বঁধু এসো।" সর্ব্ব কর্ম্মের এই মন্ত্র, "এসো এসো বঁধু এসো।" জড় জগতের নিয়ম আকর্ষণ। বৃহৎ গ্রহ, উপগ্রহকে ডাকিতেছে. "এসো এসো বঁধু এসো। সৌর পিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে,—"এসো এসো ব এসো।" জগৎ জগদন্তরকে ডাকিতেছে, "এসো এসো ব এসো।" পরমাণু পরমাণুকে অবিরত ডাকিতেছে,—"এ এসো বঁধু এসো।" জড়পিণ্ড সকল, গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু-সকলেই এই মোহমন্ত্রে বাঁধা পড়িয়া ঘুরিতেছে। এক

পুরুষকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জগতের এই গম্ভীর অবিশ্রান্তধ্বনি—"এসো এসো বঁধু এসো।" কমলাকান্তের বঁধু কি আসিবে?

"আধ আঁচরে বসো।"

এই তৃণশস্পসমাচ্ছন্ন, কণ্টকাদিতে করুণ সংসারারণ্য, হে বাঞ্ছিত! তোমাকে আর কি আসন দিব, আমার এই হৃদয়াবরণের অর্দ্ধেকে উপবেশন কর। কুশকণ্টকাদি হইতে তোমার আচ্ছাদন জন্য আমি এই আপন অঙ্গ অনাবৃত করিতেছি—আমার আঁচরে বসো। যাহাতে আমার লজ্জারক্ষা, মানরক্ষা, যাহাতে আমার শোভা, সে নিশিত! তুমিও তাহার অর্দ্ধেক গ্রহণ কর—আধ আঁচরে বসো। হে পরের হৃদয়, হে সুন্দর, হে মনোরঞ্জন, হে সুখদ! কাছে এসো, আমাকে স্পর্শ কর, আমি তোমাতে সংলগ্ন হইব,—দূরে আসনগ্রহণ করিও না—এই আমার শরীরলগ্ন অঞ্চলার্দ্ধে বসো। হে কমলাকান্ত! হে দুর্বিনীত! হে আজন্মবৰাকশূন্য, তুমি এতদর্থে শান্তিপুরে কন্যাদার আঁচলের আধখানা বুঝিও না। তুমি যে অঞ্চলার্দ্ধে বসিবে, তাহার তাঁতি আজও জন্মে নাই। মনের নগ্নত্ব জ্ঞানবস্ত্রে আবৃত; অর্দ্ধেকে তোমার হৃদয় আবৃত রাখ, অর্দ্ধেকে বাঞ্ছিতকে বসাও। তুমি মূর্খ—তথাপি তোমার অপেক্ষা মূর্খ যদি কেহ থাকে, তাহাকে ডাক—"এসো এসো বঁধু এসো—আধ আঁচরে বসো।"

"নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।"

কেহ কখন দেখিয়াছে? তুমি অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়াছ—কখন নয়ন ভরিয়া আত্মধন দেখিতে পাইয়াছ?

তুমি যশস্বী হইবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছ—কিন্তু আত্মযশোরাশি দেখিয়া কবে তোমার নয়ন ভরিয়াছে? রূপতৃষ্ণার তুমি ইহজীবন অতিবাহিত করিলে—যেখানে ফুলটি ফুটে, ফলটি দোলে, যেখানে পাখিটি উড়ে, যেখানে মেঘ ছুটে, গিরিশৃঙ্গ উঠে, নদী বহে, জল ঝরে, তুমি সেইখানে রূপের অনুসন্ধানে ফিরিয়াছ—যেখানে বালক, প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আন্দোলিত করিয়া হাসে, যেখানে যুবতী ব্রীড়াভাবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া শঙ্কিত-গমনে যায়, যেখানে প্রৌঢ়া নিতান্তস্ফুটিতা মধ্যাহ্নপদ্মিনীবৎ অকাতরে রূপের বিকাশ করে, তুমি সেইখানেই রূপের সন্ধানে ফিরিয়াছ, কখন নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়াছ? দেখ নাই কি যে, কুসুম দেখিতে দেখিতে শুকায়, ফল দেখিতে দেখিতে পাকে, পড়ে, পচে, গন্ধে; পাখী উড়িয়া যায়, মেঘ চলিয়া যায়, গিরি ধূমে লুকায়, নদী শুকায়, চাঁদ ডুবে, নক্ষত্র নিবিয়া যায়। শিশুর হাসি রোগে হরণ করে, যুবতীর ব্রীড়া—কিসে না যায়? প্রৌঢ়া বয়সে শুকাইয়া যায়। ইহা সংসারের দুরদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। অথবা এই সংসারের শুভাদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। গতিই সংসারের সুখ—চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য। নয়ন ভরে না। সে নয়ন আমরা পাই নাই। পাইলেই সংসার দুঃখময় হইত; পরিতৃপ্তি রাক্ষসী আমাদের সকল সুখকে গ্রাস করিত। যে কারিগর এই পরিবর্ত্তনশীল সংসার, আর এই অতৃপ্য নয়ন সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার কারিগরির উপর কারিগরি, এই বাসনা, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, নয়নও অতৃপ্য, অথচ বাসনা—নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

হে রূপ! হে বাহ্য সৌন্দর্য্য! হে অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট! কাছে আইস, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। দূরে বসিলে দেখা হইবে না; কেন না, দেখা কেবল নয়নে নহে। সংস্পর্শ বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদ্যুতী বহে না—আমরা সর্ব্ব শরীরে দেখিয়া থাকি। মন হইতে মনে বৈদ্যুতী চলিলে তবে নয়ন ভরিবে। হায়! কিসেই বা নয়ন ভরিবে! নয়নে যে পলক আছে!

"অনেক দিবসে, মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি হে!"

আমি কখন কখন মনে করিয়া থাকি, কেবল দুঃখের পরিমাণ জন্যই দয়া করিয়া বিধাতা দিবসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নহিলে কাল অপরিমেয়, মনুষ্য-দুঃখ অপরিমিত হইত। আমরা এখন বলিতে পারি যে, আমি দুই দিন, দুই মাস, বা দুই বৎসর দুঃখভোগ করিতেছি; কিন্তু দিন রাত্রির পরিবর্ত্তন না থাকিলে, কালের পথ চিহ্নশূন্য হইলে, কে না বুঝিত যে, আমি অনন্ত কাল দুঃখভোগ করিতেছি? আশা তাহা হইলে দাঁড়াইবার স্থান পাইত না—এত দিন পরে আবার দুঃখান্ত হইবে, এ কথা কেহ ভাবিতে পারিত না—বৃক্ষাদিশূন্য অনন্ত প্রান্তরবৎ জীবনের পথ অনুত্তীর্য্য হইত—জীবনযাত্রা দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাস্বরূপ হইত। অতএব এই বৃহৎ জগৎকেন্দ্র সূর্য্যের পথ আমাদের দুঃখের মানদণ্ড। দিবসগণনায় সুখ আছে। সুখ আছে বলিয়াই দুঃখী জন দিবস গণিয়া থাকে। দিবস গণনা দুঃখবিনোদন। কিন্তু এমন দুঃখীও আছে যে, সে দিবস গণে না; দিবস-গণনা তাহার পক্ষে দুঃখবিনোদন নহে। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—

পৃথিবীতে ভুলিয়া মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছি—সুখহীন, আশা-
হীন, উদ্দেশ্যশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য আমি কি জন্য দিবস গণিব?
এই সংসারসমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ, সংসার বাত্যায় আমি
ঘূর্ণমান ধূলিকণা, সংসারারণ্যে আমি নিষ্ফল বৃক্ষ—সংসারা-
কাশে আমি বারিশূন্য মেঘ—আমি কেন দিবস গণিব?

গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে।
১২০৩ শাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ
পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যেদিন সপ্তদশ অশ্বা-
রোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়!
কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে
বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া
ফিরিয়া সাত বার গণি। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে
বিধি মিলাইল, কই? যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব
মিলিল কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা
কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ
কই? লক্ষ্মণসেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়! সবারই
ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না?

"মণি নও মাণিক নও, যে হার করে গলে পরি—"

বিধাতা জগৎ জড়ময় করিয়াছেন কেন? রূপ জড়পদার্থ
কেন? সকলই অশরীরী হইল না কেন? হইলে হৃদয় হৃদয়ে
কেমন মিশিত! যদি রূপের শরীরে প্রয়োজন ছিল, তবে
তোমার আমার বিধাতা এক শরীর করেন নাই কেন? তাহা
হইলে আর ত বিচ্ছেদ হইত না। এখন কি এক শরীর হয়
না? আমার শরীরে এত স্থান আছে—তোমাকে তাহাতে

কোথাও কি রাখিতে পারি না? তোমাকে কণ্ঠলগ্ন করিয়া হৃদয়ে বিলম্বিত করিয়া রাখিতে পারি না? হায়! তুমি মণি নও, মাণিক নও যে, হার করিয়া গলে পরি।

আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণি মাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া, কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না! তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকে, মিসরে, চীনে, দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি!

"আমার নারী না করিত বিধি
তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ!"

প্রথমে আহ্বান, "এসো এসো বঁধু এসো" পরে আদর, "আধ আঁচরে বসো" পরে ভোগ "নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।" তখন সুখভোগকালীন পূর্ব্বদুঃখস্মৃতি—"অনেক দিবসে, মনের মানসে, তোমা ধনে মিলাইল বিধি।" সুখ দ্বিবিধ, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ সুখ যথা,

"মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি।"

পরে সম্পূর্ণ সুখ,

"আমার নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।"

সম্পূর্ণ অসহ্য সুখের লক্ষণ, শারীরিক চাঞ্চল্য, মানসিক

অশ্বৈর্য্য। এ সুখ কোথায় রাখিব, লইয়া কি করিব, আমি কোথায় যাইব, এ সুখের ভার লইয়া কোথায় ফেলিব? এ সুখের ভার লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিব; এ সুখ এক স্থানে ধরে না; যেখানে যেখানে পৃথিবীতে স্থান আছে, সেই খানে সেইখানে এ সুখ লইয়া যাইব, এ জগৎ সংসার এই সুখে পূরাইব। সংসার এ সুখের সাগরে ভাসাইব; মেরু হইতে মেরু পর্য্যন্ত সুখের তরঙ্গ নাচাইব, আপনি ডুবিয়া, উঠিয়া, ভাসিয়া হেলিয়া, ছুটিয়া বেড়াইব। এ সুখে কমলাকান্তের অধিকার নাই—এ সুখে বাঙ্গালির অধিকার নাই। সুখের কথাতেই বাঙ্গালির অধিকার নাই। গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপীকে নারী করিয়াছেন কেন—আমাদের দুঃখ, বিধাতা আমাদের নারী করেন নাই কেন—তাহা হইলে এ মুখ, দেখাইতে হইত না।

সুখের কথায় বাঙ্গালির অধিকার নাই—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্তি যত গভীর, যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন, তাহা বাঙ্গালির মর্ম্মোক্তি।—আর কাতরোক্তি, কোথায় বা নাই? নবপ্রসূত পক্ষিশাবক হইতে মহাদেবের শৃঙ্গধ্বনি পর্য্যন্ত সকলই কাতরোক্তি। সম্পূর্ণসুখে সুখীও সুখকালে পূর্ব্বদুঃখ স্মরণ করিয়া কাতরোক্তি করে। নহিলে সুখের সম্পূর্ণতা কি? দুঃখস্মৃতি ব্যতীত সুখের সম্পূর্ণতা কোথায়? সুখও দুঃখময়—

"তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।"

এই কথা সুখ দুঃখের সীমা রেখা! যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও সুখী—তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাহার বন্ধু, তাহার প্রিয়, বাঞ্ছিত—গিয়াছে, কিন্তু তাহার বৃন্দাবন আছে—মনে করিলে, সে সেই সুখভূমি পানে চাহিতে পারে। যাহার সুখ গিয়াছে—সুখের নিদর্শন গিয়াছে—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই—সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী। বিধবা যুবতী, মৃত পতির যত্নরক্ষিত পাদুকা হারাইলে, যেমন দুঃখে দুঃখী হয়, তেমনই দুঃখে দুঃখী।

আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি, এসকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? সে যে কেবল যবনলাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ! আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবনচরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে—সুখ-চিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে?

চাহিবার এক শ্মশান-ভূমি আছে,—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান-ভূমি প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর.তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাহার পা ধুয়াইতে,

সেই মাতা কোথায়? তুমি যাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমিত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাঁহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্তসৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাহার প্রসাদি ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পাভরণা কোথায়? সে রূপ, সে ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বিশ্বাসঘাতিনি, তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কলকল তর তর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে, যবনভয়ে ভীতা সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জ্জিত বর্শাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরব বিঘ্নিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কালপূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল; রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল; গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময়ে শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল, যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল।

গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা, সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কূলতীরভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি—আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে—ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ, জলে, ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতল-জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?

ত্রয়োদশ সংখ্যা।

বিড়াল।

আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন্ হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, "মেঁও!"

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে,

একণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, "মেও!"

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম, যে ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জ্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে; আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। একণে মার্জ্জারসুন্দরী, নির্জ্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ-জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন "মেও!" বলিতে পারি না, বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জ্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি সে "মেও!" শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব "তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি—এখন বল কি?"

বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটী প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জ্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া,

সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্ব্বে মার্জ্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, "মেও!" প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া, হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জ্জারের বক্তব্য সকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, "মার্ পিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে—আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয় সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে।

তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই পরম ধর্ম্মের ফলভাগী—আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়।

"দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ তাহার দণ্ড হয় না কেন?

"দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নরদামায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই

পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?

"দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার, আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড় হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—ছি! ছি!

"দেখ, আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহমার্জ্জার হইলো, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্য্যার সহোদর, বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়ারের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জ্জার কবি হইয়া পড়ে।

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা

ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, "মেও! মেও! খাইতে পাই না!—" আমাদের কাল চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই, দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিং খোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরী করিবে; কেন না অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম মার্জ্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক্! সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধন-সঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জ্জার বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধন-বৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?"

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন্ কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জ্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য।"

মার্জ্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরাম বাবুর ভাণ্ডার-ঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জ্জারকে বলিলাম যে, "এ সকল অতি নীতি-বিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল

দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্করের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে—আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙ্গের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না, যদি ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্ব্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব।”

মার্জ্জার বলিল “আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।”

মার্জ্জার বিদায় হইল একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

চতুর্দ্দশ সংখ্যা।

ঢেঁকি।

আমি ভাবি কি, যদি পৃথিবীতে ঢেঁকি না থাকিত, তবে খাইতাম কি? পাখীর মত দাঁড়ে বসিয়া ধান খাইতাম? না, লাঙ্গূলকর্ণদুল্যমানা গজেন্দ্রগামিনী গাভীর মত মরাইয়ে মুখ দিতাম? নিশ্চয় তাহা আমি পারিতাম না—নবযুবা কৃষ্ণকায় বস্ত্রশূন্য কৃষাণ আসিয়া আমাব পঞ্জরে যষ্টিপাত কবিত, আর আমি ফোঁস্ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া শৃঙ্গ লাঙ্গূল লইয়া পলাইতাম। আর্য্যসভ্যতার অনন্ত মহিমায় সে ভয় নাই—ঢেঁকি আছে—ধান চাল হয়। আমি এই পরোপকার-নিরত ঢেঁকিকে আর্য্যসভ্যতার এক বিশেষ ফল মনে করি—আর্য্য সাহিত্য, আর্য্যদর্শন আমার মনে ইহার কাছে লাগে না—রামায়ণ, কুমারসম্ভব, পাণিনি পতঞ্জলি, কেহ ধানকে চাল

করিতে পারে না। ঢেঁকিই আর্য্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী,—নিত্যপিণ্ডদান করিতেছে। শুধু কি ঢেঁকিশালে? সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মসংস্কারে, রাজসভায়,—কোথায় না ঢেঁকি আর্য্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী, নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। দুঃখের মধ্যে ইহাতেও আর্য্যসভ্যতা মুক্তিলাভ করিল না, আজিও ভূত হইয়া রহিয়াছে। ভরসা আছে কোন ঢেঁকি অচিরাৎ তাহার গয়া করিবে।

ঢেঁকির এই অপরিমেয় মাহাত্ম্যের কারণানুসন্ধানে আমি বড় সমুৎসুক হইলাম। এ ঊনবিংশ শতাব্দী, বৈজ্ঞানিক সময়—অবশ্য কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। কোথা হইতে ঢেঁকির এই কার্য্যদক্ষতা! এই পরোপকারে মতি! এই Public spirit? নাবস্তুনা বস্তুসিদ্ধিঃ?—বিনা কারণে কি ইহা জন্মে? অনুসন্ধানার্থ আমি ঢেঁকিশালে গেলাম।

দেখিলাম, ঢেঁকি খানায় পড়িতেছে। বিন্দুমাত্র মদ্যপান করে নাই, তথাপি পুনঃ পুনঃ খানায় পড়িতেছে, উঠিতেছে, বিরতি নাই। ভাবিলাম মুহুর্মুহুঃ খানায় পড়াই কি এত মাহাত্ম্যের কারণ? ঢেঁকি খানায় পড়ে বলিয়াই কি এত পরোপকারে মতি? এত টা Public spirit? ভাবিলাম—না, তাহা কখনই হইতে পারে না। কেন না আমার রামচন্দ্র ভায়াও দুই বেলা খানায় পড়িয়া থাকেন—কিন্তু কই তাঁহার ত কিছু মাত্র Public spirit নাই—শৌণ্ডিকালয়ের বাহিরে ত তাঁহার পরোপকার কিছু দেখি না। আরও—মনের কথা লুকাইলে কি হইবে? আমিও—আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী স্বয়ং, এক দিন খানায় পড়িয়াছিলাম। ডাক্তারদের বিকারবিশেষের লক্ষণে

আমার সেই গরুলোক প্রাপ্তি ঘটে নাই—কারণান্তরে। প্রসন্ন-গোয়ালিনী—গোপাঙ্গনা কুল-কলঙ্কিনী,—একদিন তাহার মঙ্গলা গাইকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ছাড়িবামাত্র মঙ্গলা, ঊর্দ্ধপুচ্ছে, প্রণতশৃঙ্গে ধাবমানা! কি ভাবিয়া মঙ্গলা ছুটিল তা বলিতে পারি না,—স্ত্রীজাতি ও গোজাতির মনের কথা কি প্রকারে বলিব? কিন্তু আমি ভাবিলাম, আমিই তাহার উভয় শৃঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য। তখন আমি কটিদেশ দৃঢ়তর বদ্ধ করিয়া, সদর্পে বদ্ধপরিকর হইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়মান। পশ্চাতে সেই ভীষণা ঘটোধ্নী রাক্ষসী! আমিও যত দৌড়াই, সেও তত দৌড়ায়। কাজেই, দৌড়ের চোট উচট খাইয়া, গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে, চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে—বিবরলোক প্রাপ্তি! "আলু থালু কেশ পাশ, মুখে না বহিছে শ্বাস"—হায়! তখন কি আমার হৃদয়-আকাশ মধ্যে Public spirit রূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল? না হইয়াছিল এমত নহে। তখন আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বসুন্ধরা যদি গোশূন্যা হয়েন, আর নারিকেল, তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে দুগ্ধ নিঃসরণ হয়, তবে এই দুগ্ধপোষ্য বাঙ্গালিজাতির বিশেষ উপকার হয়। তাহারা শৃঙ্গভীতিশূন্য হইয়া দুগ্ধ পান করিতে থাকে। সে দিন সেই বিবরপ্রাপ্তি হেতু আমার পরহিতৈষণা এতদূর প্রবল হইয়াছিল, যে, আমি প্রসন্নকে সময়ান্তরে বলিয়াছিলাম, "অয়ি দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর-নবনীত পরিবেষ্টিতা গোপকন্যে! তুমি গোরুগুলি বিক্রয় করিয়া স্বয়ং খোল ভূসি খাইতে থাক, তুমি স্বয়ং ঘটোধ্নী হইয়া [illegible] দুগ্ধ-পোষ্য প্রতিপালন করিতে পারিবে,—তাহাতেও [illegible] আছে

প্রত্যুত্তরে প্রসন্ন হঠাৎ সম্মার্জ্জনী হস্তে গ্রহণ করায়, সে দিন আমাকে পরহিতব্রত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

অতএব পরহিতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য "সাধারণ আত্মা" অর্থাৎ Public spirit, বিশেষতঃ কার্য্যদক্ষতা, এ সকল খানায় পড়িলে হয় কি না? যদি না হয়, তবে ঢেঁকির এ কার্য্যদক্ষতা, এ মহাবল কোথা হইতে আসিল? আমি এই কূটতর্কের মীমাংসার জন্য সন্নিহানচিত্তে ভাবিতেছিলাম, এমত সময়ে মধুরকণ্ঠে কে বলিল, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! হা করিয়া কি ভাবিতেছ? ঢেঁকি কখন দেখ নাই?"

চাহিয়া দেখিলাম, তরঙ্গিণী মাতঙ্গিনী দুই ভগিনী ঢেঁকিতে পাড দিতেছে। সে দিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখ নাই। হাতী দেখিতে গিয়া অন্ধ কেবল শুঁড় দেখিয়াছিল, আমিও ঢেঁকি দেখিতে গিয়া কেবল ঢেঁকির শুঁড় দেখিতেছিলাম। পিছনে যে দুই জনের দুই খান রাঙ্গা পা ঢেঁকির পিঠে পড়িতেছে তাহা দেখিয়াও দেখি নাই! দেখিবামাত্র যেন কে আমার চোখের ঠুলি খুলিয়া লইল।

আমার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল—কার্য্যকারণসম্বন্ধপরম্পরা আমার চক্ষে প্রখর সূর্য্যকিরণে প্রভাসিত হইল। ঐ ঢেঁকির বল।—ঐ ঢেঁকির মাহাত্ম্যের মূল কারণ!—ঐ রমণীপাদপদ্ম! কমলাধম পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে, আর ঢেঁকি ধান ভানিয়া চাল করিতেছে। উঠিয়া পড়িয়া—চক চক কচকচ্! কত পরোপকারই করিতেছে! হায় ঢেঁকি! তুমি পাবে কি এত গুণ! পিঠে পাইয়া তুমি এই সাতকোটি বাঙ্গালীকে অন্ন দিতেছ—তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছ! এস, মেয়েমানুষের

শ্রীচরণ! তুমি ভাল করিয়া ঢেঁকির পিঠে পড়, আমি কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হইয়া তোমায়—হায়! কি করিব?—কাঁসার মল পরাই!

আর ভাই, ঢেঁকির দল! তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি বুঝিয়াছি। যখনই পিঠে রমণীপাদপদ্ম ওরফে মেয়ে লাথি পড়ে তখনই তোমরা ধান ভান,—নহিলে কেবল কাঠ—দারুময়—গর্ত্তে শুঁড় লুকাইয়া, লেজ উচু করিয়া, ঢেঁকিশালে পড়িয়া থাক। বিদ্যার মধ্যে খাদায় পড়া, আনন্দের মধ্যে 'ধান্য': পুরস্কারের মধ্যে সেই রাঙ্গা পা। আবার শুনিতে পাই তোমাদের একটি বিশেষ গুণ আছে নাকি?—ঘরে থাকিয়া নাকি মধ্যে মধ্যে কুমীর হও? আর ভাই ঢেঁকি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—মধ্যে মধ্যে স্বর্গে যাওয়া হয় শুনিয়াছি, সত্য সত্যই কি সেখানে গিয়াও ধান ভানিতে হয়? দেবতারা সকলে অমৃত খায়, পারিজাত শোঁকে, অপ্সরা লইয়া ক্রীড়া করে, মেঘে চড়ে, বিদ্যুৎ ধরে, রতি রতিপতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে—তুমি নাকি ততক্ষণ কেবল খেচর খেচর করিয়া ধান ভান? ধন্য সাধ্য ভাই তোমার!

ঢেঁকি কোন উত্তর দিল না, কেবলই ধান ভানে। রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলাম—একেবারে কমলাশ্রমে। কমলাশ্রমটা কি? ৺নসী বাবু সম্প্রতি ধান ভানিতে গিয়াছেন। নিপ্রত্যাশী নাপিতানী একখানি ভাঙ্গা চালা ঘর রাখিয়া উত্তরাধিকারি-বিরহিতা হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে—ঘর খানির এমনি অবস্থা যে আর কেহ তাহার কামনা করিল না—সুতরাং আমি তাহাতে কমলাশ্রম করিয়াছি—কেবল কমলাকান্তের আশ্রম নহে—সাক্ষাৎ কমলার আশ্রম।

আমি সেইখানে চারপাইর উপর পড়িয়া আফিঙ্গ চড়াইলাম। তখন চক্ষু বুজিয়া আসিল। জ্ঞাননেত্র উদয় হইল। দেখিলাম এ সংসার কেবল ঢেঁকিশাল। বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপুরী সব ঢেঁকিশালা—তাহাতে বড় বড় ঢেঁকি, গড়ে নাক পুরিয়া খাড়া হইয়া রহিয়াছে। কোথাও জমীদাররূপ ঢেঁকী, প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিশিয়া, নূতন নিরিখ রূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। কোথাও আইনকারক ঢেঁকি, মিনিট রিপোর্টের রাশি গড়ে পিশিয়া, ভানিয়া বাহির করিতেছেন—আইন; বিচারক ঢেঁকি সেই আইন গুলি গড়ে পিশিয়া বাহির করিতেছেন—দারিদ্র, কারাবাস—ধনীর ধনান্ত—ভাল মানুষের দেহান্ত। বাবু ঢেঁকি, বোতল গড়ে পিতৃধন পিশিয়া বাহির করিতেছেন—পিলে যকৃৎ; তাঁর গৃহিণী ঢেঁকি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিশিয়া বাহির করিতেছেন,—অনাহার। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢেঁকি, সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে পিশিয়া বাহির করিতেছেন—স্কুলবুক!

দেখিতে দেখিতে দেখিলাম—আমিও একটা মস্ত ঢেঁকি—কমলাপ্রসে লম্বমান হইয়া পড়িয়া আছি; নেশার গড়ে মনো-দুঃখ ধান্য পিশিয়া দপ্তর-চাউল বাহির করিতেছি। মনে মনে অহঙ্কার জন্মিল—এমন চাউল ত কাহারও গড়ে হইতেছে না। তখন ইচ্ছা হইল—এ চাউল মনুষ্য-লোকের উপযুক্ত নহে, আমি স্বর্গে গিয়া ধান ভানিব। তখনই স্বর্গে গেলাম—"অশ্বমেধ-বধে।" স্বর্গে গিয়া, দেবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "হে দেবেন্দ্র! আমি শ্রীকমলাকান্ত ঢেঁকি—স্বর্গে ধান ভানিব।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "আপত্তি কি—পুরস্কার চাই কি ?"

আমি। উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা।

দেবরাজ। উর্ব্বশী মেনকা পাইবে না—আর যাহা চাহিলে তাহা ত মর্ত্যলোকেও তুমি পাইয়া থাক,—আটটার হিসাবে।

আমি ক্রুদ্ধমুখ—বলিলাম "কি ঠাকুর, অষ্টরম্ভা! সে কি আজ কাল নরলোকের পাবার যো আছে? সে আজকাল দেবতাদেরই একচেটে।"

সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ আমাকে বক্‌শিশ হুকুম করিলেন,—এক সের অমৃত, আর এক ঘণ্টার জন্য উর্ব্বশীর সঙ্গীত। চৈতন্য হইয়া দেখিলাম, পাশে বটিতে একসের দুগ্ধ,—আর প্রসন্ন, দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে—"নেশাখোর!" "বিটলে" "পেটার্থি!" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি উর্ব্বশীকে বলিলাম, "বাইজি! এক ঘণ্টা হইয়াছে—এখন বন্ধ কর।"

কমলাকান্তের পত্র ।

কমলাকান্তের পত্র।

প্রথম সংখ্যা।

১। কি লিখিব?

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন* সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু।

আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, সাবেক নিবাস শ্রীশ্রী৺নসিধাম, আপনাকে আমি প্রণাম করি। আপনার নিকট আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় নাই, কিন্তু আপনি নিজগুণে আমার বিশেষ পরিচয় লইয়াছেন, দেখিতেছি। ভীষ্মদেব খোশনবীশ, জুয়াচোর লোক আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম—আমি দপ্তরটি তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থদর্শনে যাত্রা

* "কমলাকান্তের দপ্তর" বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। যখন এই পত্রগুলি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, তখন সঞ্জীব বাবু ইহার সম্পাদক।

করিয়াছিলাম, তিনি সেই অবসর পাইয়া সেইটি আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন। বিক্রয় কথাটি আপনি স্বীকার করেন নাই, কিন্তু আমি জানি ভীষ্মদেব ঠাকুর বিনামূল্যে শালগ্রামকে তুলসী দেন না, বিনামূল্যে যে আপনাকে শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত দপ্তর দিবেন, এমত সম্ভাবনা অতি বিরল। এই জুয়াচুরির কথা আমি এত দিন জানিতাম না। দৈবাধীন একটি জোড়া জুতা কিনিয়া এ সন্ধান পাইলাম। একখানি ছাপার কাগজে জুতা যোড়াটি বান্ধা ছিল, দেখিয়া ভাবিতে-ছিলাম যে, কাহার এমন সৌভাগ্যের উদয় হইল যে, তাহার রচনা শ্রীমৎকমলাকান্ত শর্ম্মার চরণযুগলের ব্যবহার্য্য পাদুকাদ্বয় মণ্ডিত করিতেছে! মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখনীধারণ! সার্থক তাহার নিশীথতৈলদাহ! মূর্খের দ্বারা তাহার রচনা পঠিত না হইয়া সাধু জনের চরণের সঙ্গে যে কোন প্রকার সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে, ইহা বঙ্গীয় লেখকের সৌভাগ্য। এই ভাবিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া দেখিলাম যে, কাগজখানি কি। পড়িলাম, উপরে লেখা আছে, 'বঙ্গদর্শন।" ভিতরে লেখা আছে, "কমলাকান্তের দপ্তর।" তখন বুঝিলাম যে, আমারি এ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল।

আরও একটু কৌতূহল জন্মিল। বঙ্গদর্শন কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে "মহাশয় বঙ্গদর্শনটা কি, তাহা বলিতে পারেন?" তিনি অনেক ক্ষণ ভাবিলেন! অনেকক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শন করাই বঙ্গদর্শন।" আমি তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক প্রশংসা করিলাম, কিন্তু [illegible]

বন্ধুকেও ঐ প্রশ্ন করিতে হইল। অন্য বন্ধু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শকারের উপর যে রেফটি আছে, বোধ হয়, তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম; শব্দটি "বঙ্গদশন," অর্থাৎ বাঙ্গালার দাঁত। আমি তাঁহাকে চতুষ্পাঠী খুলিতে পরামর্শ দিয়া অন্য এক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বঙ্গ শব্দে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "ইহার অর্থ পূর্ব্ব বাঙ্গালা দর্শন করিবার বিধি; অর্থাৎ "A Guide to Eastern Bengal." এইরূপ বহুপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে জানিতে পারিলাম যে, বঙ্গদর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা এবং তাহাতে কমলাকান্ত শর্ম্মার মাসিক পিণ্ডদান হইয়া থাকে। এক্ষণে আবার শুনিতেছি, কোন ধনুর্দ্ধর ঐ দপ্তরগুলি নিজপ্রণীত বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। আরও কত হবে!

অতএব হে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক মহাশয়! অবগত হউন যে, আমি শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা সশরীরে ইহজগতে অদ্যাপি অধিষ্ঠান করিতেছি এবং আপনাদিগের বিশেষ আপত্তি থাকিলেও আরও কিছু দিন অধিষ্ঠান করিব এমত ইচ্ছা রাখি।

এক্ষণে কি জন্য আপনাকে অদ্য পত্র লিখিতেছি, তাহা অবগত হউন। উপরে দেখিতে পাইবেন, "শ্রীশ্রী৺ নসিধাম" লিখিয়াছি। অর্থাৎ আমার নসিবাবু শ্রীশ্রী৺ ঈশ্বরে বিলীন হইয়াছেন। ভরসা করি যে, তিনি সর্ব্বাশ্রয় শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার গতি কোন্ পথে হইয়াছে, তাহার নিশ্চিত সম্বাদ আমি রাখি না। কেবল ইহাই জানি যে, ইহলোকে তিনি নাই। অতএব আমারও আশ্রয় নাই। আফিঙ্গের কিছু গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কিছু

বন্দোবস্ত করিতে পারেন? আমার দপ্তরের জন্য আপনি খোসনবীশ মহাশয়কে কি দিয়াছিলেন বলিতে পারি না; কিন্তু আমাকে এক আধ পোয়া আফিঙ্গ পাঠাইলেই (আমার মাত্রা কিছু বেশী) আমি এক একটি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব। আপনার মঙ্গল হউক! আপনি ইহাতে দ্বিরুক্তি করিবেন না।

কিন্তু আপনার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত পাকাপাকি করিবার আগে, গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা আছে। এ কমলাকান্তি কলে, কঙ্গ্রেসের মত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত হয়— আপনার চাই কি? নাটক নবেল চাই, না পলিটিক্সের দরকার? কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার বাহার দিব? বিজ্ঞানশাস্ত্রে আপনার প্রসক্তি, না জোগোলিকতত্ত্ব রসে আপনি সুরসিক? স্থূল কথাটা, গুরু, বিষয় পাঠাইব, না লঘু বিষয় পাঠাইব? আমার রচনার মূল্য, আপনি গজ দরে দিবেন, না মণ দরে দিবেন? আর যদি গুরু বিষয়েই আপনার অভিরুচি হয়, তবে বলিবেন, তাহার কি প্রকার অলঙ্কার সমাবেশ করিব। আপনি কোটেশ্যন ভাল বাসেন, না ফুটনোটে আপনার অনুরাগ? যদি কোটেশ্যন বা ফুটনোটের প্রয়োজন হয়, তবে কোন্ ভাষা হইতে দিব, তাহাও লিখিবেন। ইউরোপ ও আসিয়ার সকল ভাষা হইতেই আমার কোটেশ্যন সংগ্রহ করা হইয়াছে—আফ্রিকা ও আমেরিকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই নাই। কিন্তু সেই সকল ভাষার কোটেশ্যন, আমি অচিরাৎ প্রস্তুত করিব, আপনি চিন্তিত হইবেন না।

যদি গুরু বিষয়ক রচনা আপনার নিতান্ত মনোনীত হয়,

তবে কি প্রকার গুরু বিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা, তাহাও জানাইবেন। আমি স্বয়ং সে দিকে কিছু করিতে পারি না পারি, আমার এক বড় সহায় জুটিয়াছে। ভীষ্মদেব খোশনবীশ মহাশয়ের পুত্র যিনি ইউটিলিটি শব্দের আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন*, তাঁহাকে আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। তিনি এক্ষণে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। এম, এ, পাস করিয়া বিদ্যার ফাঁস গলায় দিয়াছেন। গুরু বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার। ইস্কুলের বহি চাই কি? তিনি বর্ণপরিচয় হইতে রোমদেশের ইতিহাস পর্য্যন্ত সকলই লিখিতে পারেন। ন্যাচরল্ হিষ্টরির এক শেষ করিয়া রাখিয়াছেন; পুরাতন পেনি-মেগেজিন্ হইতে অনেক প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং গোল্ডস্মিথ কৃত এনিমেটেড্ নেচরের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছেন। সে সব চাই কি? গুরুর মধ্যে গুরু যে পাটীগণিত এবং জ্যামিতি, তাহাতেও সাহসশূন্য নহেন। জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি চুলোয় যাক, চতুষ্কোণমিতিতেও তাঁহার অধিকার—দৈববিদ্যাবলে তিনি আপনার পৈতৃক চতুষ্কোণ পুকুরটিও মাপিয়া ফেলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, শুনিয়া লোকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। তাঁহার ঐতিহাসিক কীর্ত্তির কথা কি বলিব? তিনি চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবনচরিত দশ পনের পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যসমালোচন-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কোমত ও হর্বট স্পেন্সরের মত খণ্ডন আছে; এবং ডাৰুইন

* ইউ-টিল—ইটি—আই।

যে বলেন, যে মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিবী স্থির আছে, তাঁহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মালতীমাধব হইতে চারি পাঁচটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সুতরাং এখানি মোটের উপরে ভারি রকমের গুরুবিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। ভরসা করি, সমালোচনাকালে আপনারা বলিবেন, বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অদ্বিতীয়।

ভরসা করি, গুরু বিষয় ছাড়িয়া লঘু বিষয়ে আপনার অভিরুচি হইবে না। কেন না, সে সকলের কিছু অসুবিধা। যোষনবীশপুত্র একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন বটে: নায়িকার নাম চন্দ্রকলা কি শশিরত্না রাখিবেন স্থির করিয়াছেন,—তাঁহার পিতা বিজয়পুরের রাজা ভীমসিংহ; আর নায়ক আর একটা কিছু সিংহ; এবং শেষ অঙ্কে শশিরত্না নায়কের বুকে ছুরি মারিয়া আপনি হা হতোস্মি করিয়া পুড়িয়া মরিবেন, এই সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের আদ্য ও মধ্যভাগ কি প্রকার হইবে, এবং অন্যান্য "নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ" কিরূপ করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। শেষ অঙ্কের ছুরি-মারা সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন; এবং আমি শপথ পূর্ব্বক আপনার নিকট বলিতে পারি যে, যে কুড়ি ছত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আটটা "হা, সখি!" এবং তেরটা "কি হলো! কি হলো!" সমাবেশ করিয়াছেন। শেষে একটি গীতও দিয়াছেন—নায়িকা ছুরি হস্তে করিয়া গায়িতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখা হয় নাই।

যদি নবেলে আপনার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলেও

আমরা অর্থাৎ খোষনবীশ কোম্পানী কিছু অপ্রস্তত নহি। আমরা উত্তম নবেল লিখিতে পারি, তবে কি না ইচ্ছা ছিল যে, বাজে নবেল না লিখিয়া ডনকুইক্‌সোট বা জিলব্লার পরিশিষ্ট লিখিব। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইখানি পুস্তকের একখানিও এ পর্য্যন্ত আমাদের পড়া হয় নাই। সম্প্রতি মেকলের এসের পরিশিষ্ট লিখিয়া দিলে আপনার কার্য্য হইতে পারে কি? সেও নবেল বটে।

যদি কাব্য চাহেন, তবে মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলিবেন। মিত্রাক্ষর আমাদের হইতে হইবে না—আমরা পয়ার মিলাইতে পারি না। তবে অমিত্রাক্ষর যত বলিবেন, তত পারিব। সম্প্রতি খোষনবীশের ছানা, জীমূত-নাদবধ বলিয়া একখানি কাব্যের প্রথম খণ্ড লিখিয়া রাখিয়া-রাছেন। ইহা প্রায় মেঘনাদবধের তুল্য—চারিটা নামের প্রভেদ আছে মাত্র। চাই?

আর যদি লঘু গুরু সব ছাড়িয়া খোষনবীশি রচনা ছাড়িয়া, সাফ কমলাকান্তি ঢঙ্গে আপনার রুচি হয়, তবে তাও বলুন, আমার প্রণীত ছাই ভস্ম যাহা কিছু লেখা থাকে, তাহা পাঠাই। মনে থাকে যেন, তাহার বিনিময়ে আফিঙ্গ লইব। ওজন কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইব—এক তিল ছাড়িব না।

আপনি কি রাজি? আপনি রাজি হউন বা না হউন, আমি রাজি।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

পলিটিক্‌স্‌।

শ্রীচরণেষু, আফিঙ্গ পাইয়াছি। অনেকটা আফিঙ্গ পাঠাইয়াছেন—শ্রীচরণকমলেষু। আপনার শ্রীচরণকমলযুগলেষু—আরও কিছু আফিঙ্গ পাঠাইবেন।

কিন্তু শ্রীচরণকমলযুগল হইতে কমলাকান্তের প্রতি এমন কঠিন আজ্ঞা কি জন্য হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। আপনি লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে নয় আইনে অন্যত্র কিছু পলিটিক্‌স্‌ কম পড়িবে—তুমি কিছু পলিটিক্‌স্‌ ঝাড়িলে ভাল হয়। কেন মহাশয়? আমি কি দোষ করিয়াছি যে, পলিটিক্‌স্‌ সবজেক্টরূপী আমা ইট মাথায় মারিব? কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী ব্রাহ্মণ, তাহাকে পলিটিক্‌স্‌ লিখিবার আদেশ কেন করিয়াছেন? কমলাকান্ত স্বার্থপর নহে—আফিঙ্গ ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই, আমার উপর পলিটিকেল চাপ কেন? আমি রাজা না

খোষামুদে, না জুয়াচোর; না ভিক্ষুক, না সম্পাদক, যে আমাকে পলিটিক্স লিখিতে বলেন? আপনি আমার দপ্তর পাঠ করিয়াছেন, কোথায় আমার এমন স্থূল বুদ্ধির চিহ্ন পাইলেন যে, আমাকে পলিটিক্স লিখিতে বলেন? আফিঙ্গের জন্য আমি আপনার খোষামোদ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমি এমন স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাপি হই নাই যে, পলিটিক্স লিখি। ধিক্ আপনার সম্পাদকতায়! ধিক্ আপনার আফিঙ্গ দানে! আপনি আজিও বুঝিতে পারেন নাই যে, কমলাকান্ত শর্ম্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্যান নহে।

আপনার এই আদেশ প্রাপ্তে বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া এক পতিত বৃক্ষের কাণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ভাবিতেছিলাম। কি করি! ভরি টাক্ আফিঙ্গ গলদেশের অধোভাগে যেন তেন প্রকারেণ প্রেরণ করিলাম। সম্মুখে শিবে কলুর বাড়ী—বাড়ীর প্রাঙ্গণে দুই তিনটা বলদ বাঁধা আছে—মাটীতে পোঁতা নাদায় কলুপত্নীর হস্তমিশ্রিত খলি-মিশান দলিত বিচালিচূর্ণ গোগণ মুদিতনয়নে, সুখের আবেশে কবলে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেছিল। আমি কতকটা স্থিরচিত্ত হইলাম—এখানে ত পলিটিক্স নাই! এই নাদার মধ্য হইতে গোগণ পলিটিক্স-বিকার-শূন্য অকৃত্রিম সুখ পাইতেছে—দেখিয়া কিছু তুপ্ত হইলাম। তখন অহিফেন-প্রসাদ-প্রসন্ন চিত্তে লোকের এই পলিটিক্সপ্রিয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার তখন বিদ্যাসুন্দর যাত্রার একটি গান মনে পড়িল।

বোবার ইচ্ছা কথা ফুটে,
খোঁড়ার ইচ্ছা বেড়ায় ছুটে,
তোমার ইচ্ছা বিদ্যা ঘটে
ইচ্ছা বটে ইত্যাদি।

আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্স—হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ পলিটিক্স; কিন্তু বোবার বাক্‌চাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুতগমনের আকাঙ্ক্ষার মত, অন্ধের চিত্রদর্শনলালসার মত, হিন্দু বিধবার স্বামিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষার মত, আমার মনে আদরের আদরিণী গৃহিণীর আদরের সাধের মত, হাস্যাস্পদ, ফলিবার নহে। ভাই পলিটিক্সওয়ালারা! আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স নাই। “জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!” ইহাই তাহাদের পলিটিক্স! তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটীতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম, শিবু কলুর পৌত্র দশমবর্ষীয় বালক, এক কাঁসি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি শ্বেতকৃষ্ণ কুকুর তাহা দেখিল। দেখিয়া, এক বার দাঁড়াইয়া চাহিয়া ক্ষুণ্ণ মনে জিহ্বা নিষ্কৃত করিল। অমল-ধবল অন্নরাশি কাংস্যপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুকুরের পেটটা দেখিলাম, নিতান্ত পড়িয়া আছে। কুকুর চাহিয়া চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, এক বার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া

হাই তুলিল। তার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে, এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক এক বার কলুর পুত্রের অন্নপরিপূরিত বদন প্রতি আড়নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেন-প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলাম—দেখিলাম, এই ত পলিটিক্স,—এই কুকুর ত পলিটিশ্যান! তখন মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম যে, কুকুর পাকা পলিটিকেল চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুকুর দেখিল—কলুপুত্র কিছু বলে না—বড় সদাশয় বালক—কুকুর কাছে গিয়া, থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোর মুখপানে চাহিয়া, হা-হা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি, এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল, তাহার পলিটিকেল এজিটেশ্যন সফল হইল;—কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া, কুকুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুকুর আগ্রহ সহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, তাহা চর্ব্বণ, লেহন, গেলন এবং হজম করণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।

যখন সেই মৎস্যকণ্টকসম্বন্ধে এই সুমহৎ কার্য্য উত্তমরূপে সমাপন হইল, তখন সেই সুচতুর পলিটিশ্যনের মনে হইল যে, আর একখানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া পলিটিশ্যন আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বালক আপনমনে গুড় তেঁতুল মাখিয়া ঘোর রবে ভোজন করিতেছে—কুকুর পানে আর চাহে না। তখন কুকুর একটি bold move অবলম্বন করিল—পাকা পলিটিশ্যন, না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ্ সাহসে ভর করিয়া আর একটু অগ্রসর

হইয়া বসিলেন। আর এক বার হাই তুলিলেন। তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুকুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, বলিতেছিলেন, হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই। তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই—এক মুষ্টি ভাত কুকুরকে ফেলিয়া দিল। পুরন্দর যে সুখে নন্দনকাননে বসিয়া সুধা পান করেন, কাটিলেন উলসি বা কাড়িলেন জেরেজ যে সুখে কর্ডিলেরের তুসি পরিয়াছিলেন, কুকুর সেই সুখে সেই অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। এমত সময়ে, কলুগৃহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। দেখেন কাছে একটা কুকুর ম্যাক্ ম্যাক্ করিয়া ভাত খাইতেছে—দেখিয়া কলুপত্নী রোষ-কষায়িত-লোচনে এক ইষ্টকখণ্ড লইয়া কুকুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ কুকুর আহত হইয়া, লাঙ্গুলসংগ্রহপূর্ব্বক বহুবিধ রাগ রাগিণী আলাপ করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল। যত ক্ষণ ক্ষীণজীবী কুকুর আপন উদরপূর্ত্তির জন্য বহুবিধ কৌশল করিতেছিল, তত ক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচালিপরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাবনা খাইতেছিল—বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থূলকায় দেখিয়া, মুখ সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া প্রসন্নমনে তাহার আহারনৈপুণ্য দেখিতেছিল। কুকুরকে দূরীকৃত করিয়া, কলুগৃহিণী এই দস্যুতা দেখিতে পাইয়া এক বংশখণ্ড লইয়া বৃষকে গোতাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে তৎপ্রতি ধাবমানা হইলেন।

কিন্তু ভাগাড়ে যাওয়া দূরে থাকুক—বৃষ এক পদও সরিল না —এবং কলুগৃহিণী নিকটবর্ত্তিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া, তাঁহার হৃদয়মধ্যে সেই শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কলুপত্নী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃষ, অবকাশমতে নাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে দুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

আমি ভাবিলাম যে, এও পলিটিক্স। দুই রকমের পলিটিক্স্ দেখিলাম—এক কুক্কুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিস্মার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দরের পলিটিশ্যন—আর উল্‌সি হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত অনেকে এই কুক্কুরের দরের পলিটিশ্যন।

তৃতীয় সংখ্যা।

বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব।

মহাশয়! আপনাকে পত্র লিখিব কি—লিখিবার অনেক অনেক শক্ত। আমি এখন যে খড়ে ঘরে বাস করি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পাশে গোটা দুই তিন ফুলগাছ পুঁতিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, কমলাকান্তের কেহ নাই—এই ফুলগুলি আমার সখা সখী হইবে। খোষামোদ করিয়া ইহাদের ফুটাইতে হইবে না—টাকা ছড়াইতে হইবে না, গহনা দিতে হইবে না, মন-যোগান গোছ কথা বলিতে হইবে না, আপনার সুখে উহারা আপনি ফুটিবে। উহাদের হাসি আছে—কান্না নাই; আমোদ আছে—রাগ নাই। মনে করিলাম, যদি প্রসন্ন গোয়ালিনী আমাকে ত্যাগ করিয়াছে তবে এই ফুলের সঙ্গে প্রণয় করিব।

তা, ফুল ফুটিল—তারা হাসিল। মনে করিলাম—মহাশয় গো! কিছু মনে করিতে না করিতে, ফুটন্ত ফুল দেখিয়া ভোমরার দল,—দাখে দাখে ঝাঁকে ঝাঁকে, ভোমরা বোল্‌তা

মৌমাছি—বহুবিধ রসাপন্ন রসিকের দল, আসিয়া আমার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন ভন্ ভন্ গুন্ গুন্ ঘন্ ঘন্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া কাণ জ্বালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম যে, হে মহাশয়গণ! এ সভা নহে, সমাজ নহে, এসোসিয়েশন, লীগ, সোসাইটি, ক্লব প্রভৃতি কিছুই নহে—কমলাকান্তের পর্ণকুটীর মাত্র, আপনাদিগের ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে হয়, অন্যত্র গমন করুন—আমি কোন রিজলিউশনই দ্বিতীয়িত করিতে প্রস্তুত নহি, আপনারা স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। গুন্ গুনের দল, তাহাতে কোন মতে সম্মত নহে—বরং ফুলগাছ ছাড়িয়া আমার কুটীরের ভিতর হল্লা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই মাত্র আপনাকে এক পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম—(আফিঙ্গ ফুরাইয়াছে)—এমত সময়ে এক ভ্রমর কুচকুচে কালো আসল ভোঁ করিয়া ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিয়া কানের কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন—লিখিব কি, মহাশয়?

ভ্রমর বাবাজি নিশ্চিত মনে করেন, তিনি বড় সুরসিক—বড় সদ্বক্তা—তাঁহার ঘ্যান্ ঘ্যানানিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া যাইবে। আমারই ফুলগাছের ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া আসিয়া আমারই কানের কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্? আমার রাগ অসহ্য হইয়া উঠিল; আমি তালবৃন্ত হস্তে ভ্রমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমি ঘূর্ণন, বিঘূর্ণন, সংঘূর্ণন প্রভৃতি বহুবিধ বক্রগতিতে তালবৃন্তাস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলাম; ভ্রমরও ডীন, উড্ডীন, প্রডীন, সমাডীন প্রভৃতি বহুবিধ কৌশল দেখাইতে লাগিল। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—[illegible]

প্রণেতা, কিন্তু হায়, মনুষ্যবীর্য্য! তুমি অতি অসার! তুমি চিরদিন মনুষ্যকে প্রতারিত করিয়া শেষ আপন অসারতা প্রমাণীকৃত কর! তুমি জামার ক্ষেত্রে হানিবলকে, পলটোবার ক্ষেত্রে চার্লসকে, ওয়াটর্লুর ক্ষেত্রে নেপোলিয়নকে, এবং আজি এই ভ্রমরসমরে কমলাকান্তকে বঞ্চিত করিলে! আমি যত পাখা ঘুরাইয়া বায়ু সৃষ্টি করিয়া ভ্রমরকে উড়াইতে লাগিলাম, ততই সে দুরাত্মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার মাথামুণ্ড বেড়িয়া ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল। কখনও সে আমার বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া, মেঘের আড়াল হইতে ইন্দ্রজিতের ন্যায় রণ করিতে লাগিল, কখনও কুম্ভকর্ণনিপাতী রামসৈন্যের ন্যায় আমার বগলের নীচে দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল; কখনও স্যাম্পসনের ন্যায় শিরোরুহমধ্যে আমার বীর্য্য সংস্থুক্ত মনে করিয়া, আমার শরন্নীরদ-নিন্দিত কুঞ্চিত শ্বেতকৃষ্ণ কেশদামমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভেরী বাজাইতে লাগিল। তখন দংশনভয়ে অস্থির হইয়া রণে ভঙ্গ দিলাম: ভ্রমর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। সেই সময়ে চৌকাঠ পায়ে বাঁধিয়া কমলাকান্ত—"পপাত ধরণীতলে!!!" এই সংসার সমরে মহারথী শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—যিনি দারিদ্র্য, চির-কৌমার এবং অহিফেন প্রভৃতির দ্বারাও কখন পরাজিত হয়েন নাই—হায়! তিনি এই ক্ষুদ্র পতঙ্গ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন।

তখন ধূল্যবলুণ্ঠিত শরীরে দ্বিরেফরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, "হে দ্বিরেফসত্তম! কোন্ অপরাধে দুঃখী ব্রাহ্মণ তোমার নিকট অপরাধী যে, তুমি তাহার লেখা পড়ার ব্যাঘাত করিতে আসিয়াছ? দেখ, আমি এই বঙ্গদর্শনে পত্র লিখিতে বসিয়াছি—পত্র লিখিলে আফিঙ্গ আসিবে—তুমি কেন

ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া তাহার বিঘ্ন কর?" আমি প্রাতে একখানি বাঙ্গালা নাটক পড়িতেছিলাম—তখন অকস্মাৎ সেই নাটকীয় রাগগ্রস্ত হইয়া বলিতে লাগিলাম—"হে ভৃঙ্গ! হে মানসরঙ্গ-তরঙ্গবিক্ষেপকারিন্! হে দুর্দান্ত পাষণ্ডভণ্ডচিত্তলণ্ডভণ্ডকারিন্! হে উদ্যানবিহারিন্—কেন তুমি ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতেছ? হে ভৃঙ্গ! হে দ্বিরেফ! হে ষট্পদ! হে অলে! হে ভ্রমর! হে ভোমরা! হে ভোঁ ভোঁ!—"

ভ্রমর ঝুপ করিয়া আসিয়া সাম্নে বসিল। তখন গুন্ গুন্ করিয়া গলা দুরস্ত করিয়া বলিতে লাগিল—আমি অহিফেন-প্রসাদে সকলেরই কথা বুঝিতে পারি—আমি স্থিরচিত্তে শুনিতে লাগিলাম।

ভৃঙ্গরাজ বলিতে লাগিলেন, "হে বিপ্র! আমার উপর এত চোট কেন? আমি কি একাই ঘ্যান্-ঘেনে! তোমার এ বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিব না ত কি করিব? বাঙ্গালি হইয়া কে ঘ্যান্ ঘ্যানানি ছাড়া? কোন্ বাঙ্গালির ঘ্যান্ ঘ্যানানি ছাড়া অন্ত ব্যবসা আছে? তোমাদের মধ্যে যিনি রাজা মহারাজা কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগড়ি ও হইলেন, তিনি গিয়া বেল্‌ভিডিয়রে ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন। যিনি হইবেন উমেদ রাখেন, তিনি গিয়া রাত্রিদিবা রাজদ্বারে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করেন। যিনি কেবল একটি চাকরির উমেদওয়ার—তাঁর ঘ্যান্ ঘ্যানানির ত আর অন্ত নাই। বাঙ্গালি বাবু যিনিই দুই চারিটা ইংরেজি বোল শিখিয়াছেন, তিনি অমনি উমেদওয়াররূপে পরিণত হইয়া, দরখাস্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে ঘ্যান্ ঘ্যান্—ডাঁশমাছির মত খাবার সময়ে, শোবার

চতুর্থ সংখ্যা

বুড়া বয়সের কথা।

সম্পাদক মহাশয়! আফিঙ্গ পৌঁছে নাই, বড় কষ্ট গিয়াছে। আজ যাহা লিখিলাম, তাহা বিস্ফারিত লোচনে লেখা। নিজ বুদ্ধিতে, অহিফেন প্রসাদাৎ নহে। একটা মনের দুঃখের কথা লিখিব।

বুড়া বয়সের কথা লিখিব। লিখি লিখি মনে করিতেছি, কিন্তু লিখিতে পারিতেছি না। হইতে পারে যে, এই নিদারুণ কথা আমার কাছে বড় প্রিয়,—আপনার মর্ম্মান্তিক দুঃখের পরিচয় আপনার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু আমি লিখিলে পড়িবে কে? যে যুবা কেবল সেই পড়ে; বুড়ায় কিছু পড়ে না। বোধ হয়, আমার এই বুড়া বয়সের কথার পাঠক জুটিবে না।

অতএব আমি ঠিক বুড়া বয়সের কথা লিখিব না। বুঝিতে

পারি না; বৈতরণীর তরঙ্গাভিহত জীবনের সেই শেষ সোপানে আজিও পদার্পণ করি নাই; আজিও আমার পারের কড়ি সংগ্রহ করা হয় নাই। আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, সে দিন আজিও আসে নাই। তবে যৌবনেও আমার আর দাবি দাওয়া নাই; মিয়াদি পাট্টার মিয়াদ ফুরাইয়াছে। এক দিকে মিয়াদ অতীত হইল, কিন্তু বাকি বকেয়া আদায় উসুল করা হয় নাই, তাহার জন্য কিছু পীড়াপীড়ি আছে; যৌবনের আর্থিরি করিয়া কারখতি লইতে পারি নাই। তাহার উপর মহাজনেরও কিছু ধারি; অনাবৃষ্টির দিনে অনেক ধার করিয়া খাইয়াছিলাম, শোধ দিতে পারি, এমত সাধ্য নাই। তার উপর পাটনির কড়ি সংগ্রহ করিবার সময় আসিল। আমার এমন দুঃখের সময়ের দুটো কথা বলিব, তোমরা যৌবনের সুখ ছাড়িয়া কি এক বার শুনিবে না?

আগে আসল কথাটা মীমাংসা করা যাউক—আমি কি বুড়া? আমি আমার নিজের কথাই বলিতেছি এমত নহে, আমি বুড়া, না হয় যুবা, দুইয়ের এক স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যাঁহারই বয়সটা একটু দোটানা রকম—যাঁরই ছায়া পূর্ব্বদিকে হেলিয়াছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, মীমাংসা করুন দেখি, আপনি কি বুড়া। আপনার কেশগুলি, হয় ত আজিও অনিন্দ্য-ভ্রমরকৃষ্ণ, হয় ত আজিও দন্ত সকল অবিচ্ছিন্ন মুক্তামালার লজ্জাস্থল, হয় ত আপনার নিদ্রা অদ্যাপি এমন প্রগাঢ় যে, দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যাও তাহা ভাঙ্গিতে পারেন না;—তথাপি, হয় ত আপনি প্রাচীন। নয় ত, আপনার কেশগুলি সাদা কালোয় গঙ্গা যমুনা হইয়া গিয়াছে, দশন মুক্তাপাতি

ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দুই একটি মুক্তা হারাইয়া গিয়াছে—নিদ্রা, চক্ষুঃ প্রতারণামাত্র, তথাপি আপনি যুবা। তুমি বলিবে ইহার অর্থ, "বয়সেতে বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।" তাহা নহে—আমি বিজ্ঞতার কথা বলিতেছি না, প্রাচীনতার কথা বলিতেছি। প্রাচীনতা বয়সেরই ফল, আর কিছুরই নহে। ধাতুবিশেষে কিছু তারতম্য হয়, কেহ চল্লিশে বুড়া, কেহ বিয়াল্লিশে যুবা। কিন্তু তুমি কখন দেখিবে না যে, বয়সের অধিক তারতম্য ঘটে। যে পঁয়তাল্লিশে যুবা বলাইতে চায়, সে হয় যম-ভয়ে নিতান্ত ভীত, নয় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছে; যে পঁয়ত্রিশে বুড়া বলাইতে চায়, সে হয় বড়াই ভালবাসে, নয় পীড়িত, নয় কোন বড় দুঃখে দুঃখী।

কিন্তু এই অর্দ্ধেক পথ অতিবাহিত করিয়া; প্রথম চসমাখানি হাতে করিয়া রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে ঠিক বলা দায় যে, আমি বুড়া হইয়াছি কি না! বুঝি বা হইয়াছি। বুঝি হই নাই। মনে মনে ভরসা আছে একটু চক্ষুর দোষ হৌক, দুই এক গাছা চুল পাকুক, আজিও প্রাচীন হই নাই। কই, কিছু ত প্রাচীন হয় নাই? এই চিরপ্রাচীন ভুবনমণ্ডল ত আজিও নবীন? আমার প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই; আমার সৌন্দর্য্য মাখা, হীরা বসান, গঙ্গার ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ ত প্রাচীন হয় নাই; প্রভাতের বায়ু, বকুল কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা, এবং নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় নাই—তেমনই সুন্দর আছে। আমি কেবল প্রাচীন হইলাম? আমি এ কথায় বিশ্বাস করিব না। পৃথিবীতে উচ্চ হাসি ত আজিও আছে, কেবল আমার হাসির দিন গেল? পৃথিবীতে

উৎসাহ, ক্রীড়া, রঙ্গ, আজিও তেমনি অপর্য্যাপ্ত, কেবল আমারই পক্ষে নাই? জগৎ আলোকময়, কেবল আমারই রাত্রি আসিতেছে? সন্মন কোম্পানির দোকানে বজ্রাঘাত হউক, আমি এ চসমা ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আমি বুড়া বয়স স্বীকার করিব না।

তবু আসে—ছাড়ান যায় না। ধীরে ধীরে দিনে দিনে পলে পলে বয়শ্চোর আসিয়া, এ দেহপুর প্রবেশ করিতেছে—আমি যাহা মনে ভাবি না কেন, আমি বুড়া, প্রতি নিশ্বাসে তাহা জানিতে পারিতেছি। অন্যে হাসে, আমি কেবল ঠোঁট চেলাইয়া তাহাদিগের মন রাখি। অন্যে কাঁদে, আমি কেবল লোকলজ্জায় মুখ ভার করিয়া থাকি—ভাবি, ইহারা এ বৃথা কালহরণ করিতেছে কেন? উৎসাহ আমার কাছে পণ্ডশ্রম—আশা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা। কই আমার ত আশা ভরসা কিছু নাই? কই—দূর হোক, যাহা নাই তাহা আর খুঁজিয়া কাজ নাই।

খুঁজিয়া দেখিব কি? যে কুসুমদাম এ জীবনকানন আলো করিত, পথিপার্শ্বে একে একে তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। যে মুখমণ্ডল সকল ভালবাসিতাম, একে একে অদৃশ্য হইয়াছে, না হয় রৌদ্রবিশুষ্ক বৈকালের ফুলের মত শুকাইয়া উঠিয়াছে। কই, আর এ ভগ্নমন্দিরে, এ পরিত্যক্ত নাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা মজলিষে সে উজ্জ্বল দীপাবলী কই? একে একে নিবিয়া যাইতেছে। কেবল মুখ নহে—হৃদয়। সে সরল, সে ভালবাসাপরিপূর্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌহার্দ্দ্যে স্থির, অপরাধেও অচল, সে বন্ধুহৃদয় কই? নাই। কার দোষে নাই? আমার

দোষে নহে। বন্ধুরও দোষে নহে। বয়সের দোষে অথবা এদের দোষে।

তাতে ক্ষতি কি? একা আসিয়াছি, একা যাইব—তাহার ভাবনা কি? এ লোকালয়ের সঙ্গে আমার বনিয়া উঠিল না—আচ্ছা—রোখসোদ। পৃথিবি! তুমি তোমার নিয়মিত পথে আবর্ত্তন করিতে থাক, আমি আমার অভীষ্ট স্থানে গমন করি—তোমায় আমায় সম্বন্ধরহিত হইল—তাহাতে, হে পৃথ্বি জড়পিণ্ডগৌরব-পীড়িতে বসুন্ধরে! তোমারই বা ক্ষতি কি, আমারই বা ক্ষতি কি? তুমি অনন্ত কাল, শূন্যপথে ঘুরিবে, আমি আর অল্প দিন ঘুরিব মাত্র। তার পরে তোমার কপালে ছাইগুলি দিয়া, যাঁর কাছে সকল জ্বালা জুড়ায়, তাঁর কাছে গিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব!

তবে, স্থির হইল এক প্রকার যে, বুড়া বয়সে পড়িয়াছি। এখন কর্ত্তব্য কি? "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ?" এ কোন গণ্ডমূর্খের কথা! আবার বন কোথা? এ বয়সে, এই অট্টালিকাময়ী লোকপূর্ণা আপণীগনাকুলা নগরই বন। কেন না, হে বর্ষীয়ান্ পাঠক! তোমার আমার সঙ্গে আর ইহার মধ্যে কাহারও সহৃদয়তা নাই। বিপদ্‌কালে কেহ কেহ আসিয়া বলিতে পারে যে, "বুড়া! তুমি অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে কি করিব বলিয়া দাও,—" কিন্তু, সম্পদকালে কেহই বলিবে না, "বুড়া! আজি আমার আনন্দের দিন, তুমি আসিয়া আমাদিগের উৎসব বৃদ্ধি কর!" বরং আমোদ আহ্লাদ কালে বলিবে, দেখ ভাই, যেন বুড়া বেটা জানিতে না পারে।" তবে আর অরণ্যের বাকি কি?

যেখানে আগে ভালবাসার প্রত্যাশা করিতে, এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় বা ভক্তির পাত্র। যে পুত্র তোমার যৌবন-কালে, তাহার শৈশবকালে, তোমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াও অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিয়া, তোমার অনুসন্ধান করিত, সে এখন লোকমুখে সম্বাদ লয়, পিতা কেমন আছেন। পরের ছেলে, সুন্দর দেখিয়া যাহাকে কোলে তুলিয়া, তুমি আদর করিয়াছিলে, সে এখন কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত, কর্কশকান্তি, হয় ত মহাপাপিষ্ঠ, পৃথিবীর পাপস্রোত বাড়াইতেছে, হয় ত, তোমারই সেবক—তুমি কেবল কাঁদিয়া বলিতে পার, "ইহাকে আমি কোলে পিঠে করিয়াছি।" তুমি যাহাকে কোলে বসাইয়া, ক, খ শিখাইয়াছিলে, সে হয় ত এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তোমার মূর্খতা দেখিয়া মনে মনে উপহাস করে। যাহারই স্কুলের বেতন দিয়া তুমি মানুষ করিয়াছিলে, সে হয় ত এখন তোমাকে টাকা ধার দিয়া, তোমারই কাছে সুদ খায়। তুমি যাহাকে শিখাইতে, হয় ত সেই তোমায় শিখাইতেছে। যে তোমার অগ্রাহ্য ছিল, তুমি আজি তার অগ্রাহ্য। আর অরণ্যের বাকি কি?

অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া, বহির্জগতেও এইরূপ দেখিবে। যেখানে তুমি স্বহস্তে পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলে,—বাছিয়া বাছিয়া, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বিগোনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেরিয়া, আনিয়া পুঁতিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে, ছোলা মটরের চাস,—হাবাধন পোদ গামছা কাঁদে, মোটা মোটা বলদ লইয়া, নির্ব্বিঘ্নে লাঙ্গল দিতেছে—সে লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয়মধ্যে

প্রবেশ করিতেছে। যে অট্টালিকা তুমি যৌবনে, অনেক সাধ মনে মনে রাখিয়া, অনেক সাধ পূরাইয়া, যত্নে নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, যাহাতে পালঙ্ক পাড়িয়া নয়নে নয়নে অধরে অধরে মিলাইয়া, ইহ-জীবনের অনশ্বর প্রণয়ের প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ করিয়াছিলে, হয় ত দেখিবে, সে গৃহের ইষ্টক সকল দামু ঘোষের আস্তাবলের সুরকির জন্য চূর্ণ হইতেছে; সে পালঙ্কের ভগ্নাংশ লইয়া কৈলাসীর মা পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিতেছে—আর অরণ্যের বাকি কি? সকল জ্বালার উপর জ্বালা, আমি সেই যৌবনে যাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম—এখন সে কুৎসিত। আমার প্রিয়বন্ধু দামু মিত্র, যৌবনের রূপে স্ফীতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্ব্বে বেড়াইত—কত মাগী গঙ্গার ঘাটে, স্নানকালে তাহাকে দেখিয়া নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া ফুল দিতে, "দামু মিত্রায় নমঃ" বলিয়া ফুল দিয়াছে। এখন সেই দামু মিত্র শুষ্ককণ্ঠ, পলিতকেশ, দন্তহীন, লোলচর্ম্ম, শীর্ণকায়। দামুর, একটা ব্রাণ্ডি আর তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল,—এখন দামু নামাবুলীর ভয়ে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে, পাত মুছিয়া ফেলে। আর অরণ্যের বাকি কি?

গঙ্গার মাকে দেখ। যখন আমার সেই পুষ্পোদ্যানে, তরঙ্গিণী নামে যুবতী ফুল চুরি করিতে যাইত, মনে হইত, নন্দনকানন হইতে সচল সপুষ্প পারিজাত বৃক্ষ আনিয়া কে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার অলকদাম লইয়া উদ্যান-বায়ু ক্রীড়া করিত, তাহার অঞ্চলে কাঁটা বিঁধিয়া দিয়া, গোলাপ গাছ রস-কেলি করিত। আর আজি গঙ্গার মাকে দেখ। বকাবকি করিতে করিতে চাল ঝাড়িতেছে—মলিনবসনা, বিকটদশনা,

তীব্ররসনা—দীর্ঘাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, লোলচর্ম্ম, পলিতকেশ, শুষ্কবাহু; কর্কশ-কণ্ঠ। এই সেই তরঙ্গিণী—আর অরণ্যের বাকি কি?

তবে স্থির, বনে যাওয়া হবে না। তবে কি করিব? হিন্দু-শাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া কালিদাসও সর্ব্বগুণবান রঘুগণের বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি—কালিদাস চাল্লিশ পার হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে লিখিয়াছিলেন, এবং কুমার-সম্ভব চল্লিশ পার করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি দুইটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

প্রথম অজবিলাপে,

"ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম।
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তরষট্পদস্বনম্॥"*

এটি যৌবনের কান্না।

তার পর রতিবিলাপে,

"গতএব ন তে নিবর্ত্ততে স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্য মামবিসহ্যব্যসনেন ধূমিতাম্॥" †

---

* বায়ুবশে অলকাগুলিন চালিত হইতেছে—অথচ বাক্যহীন তোমার এই মুখ রাত্রিকালে প্রমুদিত, সুতরাং অভ্যন্তরে ভ্রমর-গুঞ্জন-রহিত একটি পদ্মের ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

† তোমার সেই সখা বায়ুতাড়িত দীপের ন্যায় পরলোকে গমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। আমি নির্ব্বাণিত দীপের দশাবৎ অসহ্য দুঃখে ধূমিত হইতেছি দেখ।

এটি বুড়া বয়সের কান্না।—

তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বয়সের গৌরব বুঝিলেও কখনও বৃদ্ধের কপালে মুনিবৃত্তি লিখিতেন না। বিস্মার্ক, মোল্‌ট্‌কে ও ফ্রেডেরিক বুড়া; তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে—জর্ম্মান ঐকজাত্য কোথা থাকিত? টিয়র প্রাচীন—টিয়র মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে ফ্রান্সের স্বাধীনতা এবং সাধারণতন্ত্রাবলম্বন কোথা থাকিত? গ্লাডষ্টোন এবং ডিস্রেলি বুড়া—তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে পার্লিমেণ্টের রিফর্ম এবং আয়রিশ্‌ চর্চ্চের ডিসেষ্টাব্লিষমেণ্ট কোথা থাকিত?

প্রাচীন বয়সই বিষয়চেষ্টার সময়। আমি অস্ত্র-দন্তহীন ত্রিকালের বুড়ার কথা বলিতেছি না—তাঁহারা দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত। যাঁহারা আর যুবা নাই বলিয়াই বুড়া, আমি তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি। যৌবন কর্ম্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ ভাল হয় না। একে বুদ্ধি অপরিপক্ক, তাহাতে আবার রাগ দ্বেষ ভোগাসক্তি, এবং স্ত্রীগণের অনুসন্ধানে তাহা সতত হীনপ্রভ; এজন্য মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্য্যক্ষম হয় না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, এবং ভোগাসক্তির অনধীন, এজন্য সেই কার্য্যকারিতার সময়। এই জন্য আমার পরামর্শ, যে বুড়া হইয়াছি বলিয়া, কেহ স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির ভাণ করিবে না। বার্দ্ধক্যেও বিষয়চিন্তা করিবে।

তোমরা বলিবে, এ কথা বলিতে হইবে না; কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি থাকিতে বিষয়চেষ্টা পরিত্যাগ করে না। মাতৃস্তনপান অবধি উইল করা পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধ কেবল বিষয়া-

বেষণে বিব্রত। সত্য, কিন্তু আমি সেরূপ বিষয়ানুসন্ধানে বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না। যৌবনে যে কাজ করিয়াছ, সে আপনার জন্য; তার পর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিও না যে, আজিও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না—পরের কাজ করিব কি? আপনার কাজ ফুরায় না—যদি মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত হইত, তবু আপনার কাজ ফুরাইত না—মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই—অন্ত নাই। তাই বলি, বার্দ্ধক্যে আপনার কাজ ফুরাইয়াছে, বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

যদি বল, বার্দ্ধক্যেও যদি আপনার জন্য হৌক, পরের জন্য হৌক, বিষয়-কার্য্যে নিরত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিন্তা করিব কবে?—পরকালের কাজ করিব কবে? আমি বলি, আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীন কালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন? শৈশবে, কৈশোরে যৌবনে, বার্দ্ধক্যে সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই—ইহার জন্য অন্য কোন কার্য্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত হইলে সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।

আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের এ সকল কথা ভাল লাগিতেছে না। তাঁহারা এতক্ষণ বলিতেছেন, তরঙ্গিণী যুবতীর কথা হইতেছিল—হইতে হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন? এই মাত্র বুড়া বয়সের ঢেঁকি পাতিয়া, বঙ্গদর্শনের

জন্ত খান শুনিতেছিলে—আবার এ শিবের গীত কেন? দোষ হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু, মনে মনে বোধ হয় যে, সকল ধানেই একটু একটু শিবের গীত ভাল।

ভাল হউক, বা না হউক, প্রাচীনের অন্য উপায় নাই। তোমার তরঙ্গিণী হেমাঙ্গিনী সুরঙ্গিণী কুরঙ্গিণীর দল, আর আমার দিকে ঘেঁষিবে না। তোমার মিল, কোমত, স্পেন্সর, ফয়রবাক, মনোরঞ্জন করিতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অসার—সকলই অন্ধের মৃগয়া। আজিকার বর্ষার দুর্দ্দিনে,—আজি এ কালরাত্রির শেষ কুলগ্নে,—এ নক্ষত্র-হীন অমাবস্যার নিশীথ মেঘাগমে,—আমায় আর কে রাখিবে? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রখরবাহিনী বৈতরণীর আবর্ত্তভীষণ উপকূলে—এ দুস্তর পারাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে? অতি বেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে—অন্ধকার, প্রভো! চারি দিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভরে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে?

পঞ্চম সংখ্যা।

কমলাকান্তের বিদায়।

সম্পাদক মহাশয়!

বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না, আমার আপনার সঙ্গে আর আমার বনিল না। আর কি লেখা হয়? বেসুরে কি এ বাঁশী বাজে? বাঁশী বাজি বাজি করে, তবু বাজে না—বাঁশী ফাটিয়াছে। আমার বাজ দেখি, হৃদয়ের বংশী! হায়! তুই কি আর তেমনি করিয়া বাজিতে জানিস্? আর কি সে তান মনে আছে? না, তুই সেই আছিস—না আমি সেই আমি আছি। তুই ঘুণে ধরা বাঁশী—আমি ঘুণে ধরা—আমি ঘুণে ধরা কি কি ছাই তা আমি জানি না। আমার সে স্বর নাই—আর বাজাইব কি? আর সে রস নাই, শুনিবে কে? এক বার বাজ দেখি, হৃদয়! এই

জগৎ সংসারে—বধির, অর্থচিন্তায় বিব্রত, মূঢ় জগৎ সংসারে, সেইরূপ আবার মনের লুকান কথাগুলি তেমনি করিয়া বল্ দেখি? বলিলে কেহ শুনিবে কি? তখন বয়স্ ছিল—কত কাল হইল সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম—এখন সে বয়স, সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি? আর সে বসন্ত নাই—এখন, গলা-ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি?

ভাই, আর কথায় কাজ নাই—আর বাজিয়া কাজ নাই—ভাঙ্গা বাঁশে মোটা আওয়াজে আর কুকুর-রাগিণী ভাঁজিয়া কাজ নাই। এখন হাসিলে কেহ হাসিবে না—কাঁদিলে বরং লোকে হাসিবে। প্রথম বয়সের হাসিকান্নায় সুখ আছে—লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাঁদে;—এখন হাসিকান্না। ছি!—কেবল লোকহাসান!

হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি—কমলাকান্তের আর সে রস নাই। আমার সে নসীবাবু নাই—অহিফেনের জনাটন—সে প্রসন্ন কোথায় জানি না—তাহার সে মঙ্গলা গাভী কোথায় জানি না। সত্য বটে, আমি তখনও একা—এখনও একা—কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র—এখন আমি একায় আধখানা। কিন্তু একার এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম—কবে মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম—কবে শুকাইয়াছে তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে জলবিম্ব, একবার জলস্রোতে সূর্য্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম—তাহার জন্য আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার এত বন্ধন কেন? এ দেহ পচিয়া উঠিল—ছাই ভস্ম মনের বাঁধনগুলা পচে না।

কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নিবে না কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল—এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শুকাইয়াছে—এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে—যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে—পিণ্ডদান কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে—যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন আবার তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন? বাঁশী ফাটিয়াছে—আবার খ, গ, ম কেন? প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন?

তবু কাঁদি। জন্মিবা মাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।

অনুগত, খগত এবং বিগত

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

কমলাকান্তের জোবানবন্দী

কমলাকান্তের জোবানবন্দী

খোষ নবিশ জুনিয়র প্রণীত।

সেই আফিঙ্গখোর কমলাকান্তের অনেক দিন কোন সম্বাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ সম্প্রতি এক দিন তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দেখিলাম। দেখি যে, ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে। মনে করিলাম, আর কিছু না, ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিঙ্গ চুরি করিয়াছে—অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুরি করিবে না—ইহা শ্চিত জানি। নিকটে একজন কালোকোর্ত্তা কনষ্টেবলও লাম। আমি বড় দাঁড়াইলাম না—কি জানি যদি কমলা- জামিন হইতে বলে। তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগি- ম, কাণ্ডটা কি হয়।

কিছুকাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল। তখন একজন কনষ্টেবল রুল ঘুরাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া এজ্‌লাসে লইয়া গেল। আমি পিছু পিছু গেলাম। দাঁড়াইয়া, দুই একটি কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম।

এজ্‌লাসে, প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধর্ম্মাবতার—পদে ও গৌরবে ডিপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে—সাক্ষী। মোকদ্দমা গোরুচুরি। ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটরায় পূরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাশী ধমকাইল—"হাস কেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "বাবা কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি—যে, আমাকে এর ভিতর পূরিলে?"

চাপরাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, "তামাসার জায়গা এ নয়—হলফ পড়।"

কমলাকান্ত বলিল, "পড়াও না বাপু।"

একজন মুহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল; "বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া..."

কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব?

মুহুরি। শুনতে পাও না—"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্ব্বনাশ!

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্ব্বনাশ কি?"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি—এ কথা বলতে হবে?

হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের কায়দাই এই।

কমলা। হজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা কয় বলিলাম—কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব সেটা কি ভাল?

হাকিম। এর আর মিথ্যা কথা কি?

কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, "তত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত?" প্রকাশ্যে বলিল, "ধর্ম্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চসমা নাকে দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন—কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না—তখন কেমন করিয়া বলি—আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

ফরিয়াদীর উকীল চটিলেন—তাঁহার মূল্যবান্ সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে, তাহা এই দরিদ্র সাক্ষী নষ্ট করিতেছে। উকীল তখন গরম হইয়া বলিলেন, "সাক্ষী মহাশয়! Theological Lecture টা ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখিলে ভাল হয় না? এখানে আইনের মতে চলিতে মন স্থির করুন।"

কমলাকান্ত তাহার দিকে ফিরিল। বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, "আপনি বোধ হইতেছে উকীল।"

উকীল। (হাসিয়া) কিসে চিনিলে?

কমলা। বড় সহজে। মোটা চেন আর ময়লা শামলা

দেখিয়া। তা, মহাশয়! আপনাদের জন্য এ Theological Lecture নয়। আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার

এখন মোয়াক্কেল আসে।

উকীল সরোষে উঠিয়া হাকিমকে বলিলেন, "I ask the protection of the Court against the insults of this witness."

কোর্ট বলিলেন, "Oh Baboo! the witness is your own witness, and you are at liberty to send him away if you like."

এখন, কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকীল বাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না—সুতরাং উকীল বাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কমলাকান্ত ভাবিলেন, এ হাকিমটি জাতিভ্রষ্ট—পালের মত নয়।

হাকিম গতিক দেখিয়া, মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "ওথের প্রতি সাক্ষীর objection আছে—উহাকে simple affirmation দাও।" তখন মুহুরি কমলাকান্তকে বলিল, "আচ্ছা, ও ছেড়ে দাও—বল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—বল।"

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে ভাল হয় না?

মুহুরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার! সাক্ষী বড় সরকশ্‌।"

উকীল বাবু হাঁকিলেন, "Very obstructive"।

কমলাকান্ত। (উকীলের প্রতি) "শাদা কাগজে দস্তখত

করিয়া লওয়ার প্রথাটা আদালতের বাহিরে চলে. আমি—ভিতরেও চলিবে কি?"

উকীল। শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতে

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তাহা না জানিয়া, প্রতিজ্ঞা করা, আর কাগজে কি লেখা হয়, তাহা না দেখিয়া, দস্তখত করা, একই কথা।

হাকিম তখন মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "প্রতিজ্ঞা আগে ইহাকে শুনাইয়া দাও—গোলমালে কাজ নাই।" মুহুরি তখন বলিল, "শোন, তোমাকে বলিতে হইবে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, আমি কোন কথা গোপন করিব না—সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না।"

কমলা। ওঁ মধু মধু মধু।

মুহুরি। সে আবার কি?

কমলা। পড়ান, আমি পড়িতেছি।

কমলাকান্ত তখন আর গোলযোগ না করিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিল। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য উকীল বাবু গাত্রোত্থান করিলেন, কমলাকান্তকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, "এখন আর পাগ্‌লামি করিও না—আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।"

কমলা। আপনি যা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে? আর কিছু বলিতে পাইব না?

উকীল। না।

কমলাকান্ত তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,

"অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, 'কোন কথা গোপন করিব না।' ধর্ম্মাবতার, বে আদবি মাফ হয়! পাড়ায় আজ এক যাত্রা হইবে, শুনিতে যাইব ইচ্ছা ছিল; সে সাধ এইখানেই মিটিল। উকীল বাবু অধিকারী—আমি যাত্রার ছেলে, যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব, যা না বলাইবেন, তা বলিব না। যা না বলাইলেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধ লইবেন না।"

হাকিম। যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিবে, তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বলিতে পার।

কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব।" উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, "তোমার নাম কি?"

কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

উকীল। তোমার বাপের নাম কি?

কমলা। জোবানবন্দীর আভ্যন্তরিক আছে না কি?

উকীল গরম হইলেন, বলিলেন, "হুজুর! এ সব Contempt of Court. হুজুর, উকীলের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন—বলিলেন, "আপনারই সাক্ষী।" সুতরাং উকীল আবার কমলাকান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন, "বল। বলিতে হইবে।"

কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জাতি?"

কমলা। আমি কি একটা জাতি?

উকীল। তুমি কোন্ জাতীয়?

কমলা। হিন্দু জাতীয়।

উকীল। আঃ! কোন্ বর্ণ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

উকীল। দূর হোক ছাই! এমন সাক্ষীও আছে। ...লি... তোমার জাত আছে?

কমলা। মারে কে?

হাকিম দেখিলেন, উকীলের কথায় হইবে না। বলিলেন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে জান —তুমি তার কোন্ জাতির ভিতর?"

কমলা। ধর্ম্মাবতার! এ উকীলেরই বুদ্ধি! দেখিতেছেন আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—ইহাতেও যে উকীল বুঝেন নাই যে, আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কি প্রকারে জানিব?

হাকিম লিখিলেন, "জাতি ব্রাহ্মণ।" তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত?"

...পাসে একটা ক্লক ছিল—তাহার পানে চাহিয়া হিসাব কমলাকান্ত বলিল, "আমার বয়স ৫১ বৎসর, দুই মাস, ...ন, চারি ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট—"

...ল। কি জ্বালা! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায়?

...লা। কেন এই মাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, কোন ...পন করিব না।

...ল। তোমার যা ইচ্ছা কর! আমি তোমায় পারি ...মার নিবাস কোথা?

...। আমার নিবাস নাই।

...। বলি, বাড়ী কোথা?

কমলা। বাড়ী দূরে থাক্, আমার একটা কুঠারী

উকীল। তবে থাক কোথা?

কমলা। যেখানে সেখানে।

উকীল। একটা আড্ডা ত আছে?

কমলা। ছিল, যখন নসীবাবু ছিলেন। এখন আর নাই।

উকীল। এখন আছ কোথা?

কমলা। কেন, এই আদালতে।

উকীল। কাল ছিলে কোথা?

কমলা। একখানা দোকানে।

হাকিম বলিলেন, "আর বকাবকিতে কাজ নাই—আমি লিখিয়া লইতেছি, নিবাস নাই। তার পর?

উকীল। তোমার পেশা কি?

কমলা। আমার আবার পেশা কি? আমি কি উকীল না বেশ্যা, যে আমার পেশা আছে?

উকীল। বলি, খাও কি করিয়া?

কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে তুলিয়া, মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি।

উকীল। সে ডাল ভাত জোটে কোথা থেকে?

কমলা। ভগবান্ জোটাইলেই জোটে, নইলে জো

উকীল। কিছু উপার্জ্জন কর?

কমলা। এক পয়সাও না।

উকীল। তবে কি চুরি কর?

কমলা। তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বেই আপনার হইতে হইত। আপনি কিছু ভাগও পাইতেন।

উকীল, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া, আদালতকে বলিলেন, ষ্মি এ সাক্ষী চাহি না। আমি ইহার জোবানবন্দী করাইতে ব না।"

প্রসন্ন বাদিনী, উকীলের কোমর ধরিল; বলিল, "এ ! ছাড়া হইবে না। এ বামন সত্য কথা বলিবে, তাহা য জানি—কখনও মিছা বলে না। উহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা তে জান না—তাই ও অমন করিতেছে। ও বামনের ব পেশা কি ? ও এর বাড়ী ওর বাড়ী থেকে বেড়ায়, ওকে রপা করিতেছ, উপার্জ্জন কর! ও কি বল্‌বে ?"

উকীল তখন হাকিমকে বলিল, "লিখুন, পেশা ভিক্ষা।"

এবার কমলাকান্ত রাগিল, "কি ? কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী কাপজীবী ? আমি মুক্তকণ্ঠে হলফের উপর বলিতেছি, কখনও কাহারও কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চাই না।"

প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না—সে বলিল, "সে কি ব ! কখন আফিঙ্গ চেয়ে খাও নাই ?

কমলা। দূর্ মাগি ধেমো গোয়ালার মেয়ে! আফিঙ্গ পয়সা! আমি কখন একটি পয়সাও কাহারও কাছে ভিক্ষা ই।

হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "কি লিখিব, কমলাকান্ত ?"

কমলাকান্ত নরম হইয়া বলিল, "লিখুন, পেশা ব্রাহ্মণভোজ-নিমন্ত্রণ-গ্রহণ।" সকলে হাসিল—হাকিম্ তাই লিখিয়া

ন উকীল মহাশয় মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা "তুমি ফির্য়াদীকে চেন ?"